প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস

উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, 2009

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : বাংলা **স্নাতকোত্তর পাঠক্রম**

পাঠক্রম : পর্যায়

PGB : 08 : 1 & 2

এক. ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণা এবং ক্ষেত্রসমীক্ষা-পদ্ধতি

রচনা
অধ্যাপক স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
অধ্যাপিকা শিবানী ঘোষ

সম্পাদনা
অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত

দুই. অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা, বিকাশধারা এবং প্রকরণ-প্রণালী

রচনা
শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মজুমদার

সম্পাদনা
অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত
ও
অধ্যাপক পুলিন দাশ

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. তরুণ কুমার মণ্ডল
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGB : 08

বাংলা বিষয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায়

(1)

॥ গবেষণা পদ্ধতি ॥

1.0	প্রশ্নমাল	...	1
1.1	প্রশ্নমালা—তথ্যসারণি	...	1
1.2	প্রশ্নমালার বিভিন্ন স্বরূপ	...	2
1.3	প্রশ্নমালা গঠন	...	2
1.4	প্রশ্নের বিষয়	...	4
1.5	প্রশ্নের বিন্যাসক্রম	...	5
1.6	প্রশ্নমালার সুবিধা	...	6
1.7	প্রশ্নমালার অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা	...	7
2.0	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ	...	8
2.1	সম্পাদনা	...	8
3.0	তথ্য বিশ্লেষণ	...	12
3.1	সংখ্যাতাত্ত্বিক উপস্থাপনা	...	13
4.0	রিপোর্ট রচনা	...	13
4.1	নামপত্র	...	14
4.2	মুখবন্ধ ও স্বীকৃতি	...	16
4.3	বিষয়সূচি	...	16
4.4	রিপোর্টের মূল পাঠ্যাংশ	...	16
4.5	উপসংহার	...	21
5.0	গবেষণা-প্রস্তাব সূত্রবদ্ধ করার জন্য ICCSR নির্দেশিকা	...	21
5.1	সাহিত্য-গবেষণার সংক্ষিপ্তসার রচনার নির্দেশিকা পত্র	...	28
6.0	অনুশীলনী	...	30

পর্যায়

(2)

একক 1	অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা, বিকাশধারা এবং প্রকরণ প্রণালী	...	33
একক 2	অনুবাদের সমস্যা এবং সমাধান	...	51

১.০ প্রশ্নমালা (Questionaire)

সমাজ-গবেষণা, বিশেষত সমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নমালার (questionaire) ব্যবহার বহুল প্রচলিত। বিশাল, বৈচিত্র্যময় ও ছড়িয়ে-থাকা গোষ্ঠীগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার এটি এক উপযোগী ও বিশ্বস্ত পদ্ধতি। শুধুমাত্র ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও পরিমাণগত তথ্য নয়, গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যও প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সামাজিক পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু বিশেষ ব্যতিক্রম বাদ দিলে, অন্যান্য বেশীর ভাগ গবেষণার কাজে এই পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গো একসাথে প্রয়োগ করা হয়।

প্রশ্নমালা হল প্রশ্নের এক তালিকা যা উত্তরের জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছে পাঠানো হয় এবং যার ফলাফলকে একটি প্রমিত আকারে সারনিবদ্ধ করা যায় ও সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে বিচার করা যায়। গুডি ও হাট (Goode, W.J. & Hatt, P.K., Methods in Social Research, McGraw-Hill, 1952) একে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করার এক পদ্ধতি বলেছেন, যাতে এক নিদর্শ বা ফর্ম অনুসরণ করে উত্তরদাতা নিজেই সেই ফর্ম ভর্তি করেন। 'ডিকশনারি অফ স্ট্যাটিসটিকাল টার্মস' অনুযায়ী, প্রশ্নমালা হল, "প্রশ্নের এক সমাহার বা ক্রম, যার লক্ষ্য কোনও বিষয় বা বিষয়গুচ্ছের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি সম্পর্কে আরও ভাল করে অবহিত হওয়া।"

১.১ প্রশ্নমালা-তথ্যসারণি (Questionaire-schedule)-সাক্ষাৎকার সহায়িকা (Interview guide)

কোনও কোনও সময়ে 'প্রশ্নমালা', 'তথ্যসারণি' ও 'সাক্ষাৎকার সহায়িকার' মধ্যে প্রভেদ করা হয়। প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা বা সংবাদদাতা নিজেই ফর্ম ভর্তি করে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে থাকেন। সাধারণত ডাকে পাঠানো এই ফর্ম ভর্তির সময়ে উত্তরদাতাকে সহায়তা করার জন্য গবেষক বা প্রেরক নিজে উপস্থিত থাকেন না। তথ্যসারণি বা সেডিউলের ক্ষেত্রে কিন্তু গবেষক বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতার মুখোমুখি বসে নিজেই প্রশ্ন সংবলিত ফর্মটি ভর্তি করেন এবং প্রয়োজনমত উত্তরদাতাকে সাহায্য করেন। সাক্ষাৎকার-সহায়িকায় বিষয় বা বক্তব্যের একটি গুচ্ছ থাকে, যেটি অনুসরণ করে সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারী উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এটি একটি খুবই উপযোগী পদ্ধতি, কারণ এতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গবেষণার সবকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে সাক্ষাৎকারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কখনও কখনও প্রশ্নমালা বা তথ্যসারণিকে সাক্ষাৎকার-সহায়িকা হিসাবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সমীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের ও বৈচিত্র্যময় তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রশ্নমালা ও তথ্যসারণি উভয়েই বেশী করে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। যেখানে উত্তরদাতারা এক বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছেন, সেখানে বিশেষ করে প্রশ্নমালার ব্যবহার আরও বেশী উপযোগী ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। এর আর একটি সুবিধা হল বাইরের প্রভাব থেকে উত্তরদাতাকে মুক্ত রাখা। এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতা তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও

বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। বাইরের প্রভাব ছাড়া সংগৃহীত তথ্য সব সময়েই বেশী বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য হয়।

১.২ প্রশ্নমালার বিভিন্ন স্বরূপ

প্রশ্নমালাকে মোটামুটি দু ভাগে বিভক্ত করা যায় : পরিকল্পিত প্রশ্নমালা ও অপরিকল্পিত প্রশ্নমালা।
পউলিন ভি. ইয়ঙের মতে, "পরিকল্পিত প্রশ্নমালাতে কিছু নির্দিষ্ট পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্ন করা হয়, অর্থাৎ প্রশ্নগলিকে আগেভাগেই প্রকৃত নেওয়া হয় এবং ঘটনাস্থলেই প্রশ্ন করার সময় সেগুলিকে স্থির করা হয়না।" অতিরিক্ত প্রশ্নের কথা তখনই চিন্তা করা হয় বা জিজ্ঞাসা করা হয়, যখন উত্তরদাতার কাছে থেকে কোনও অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা তথ্যের প্রয়োজন হয়। বয়স, বৈবাহিক অবস্থান, সন্তানসন্ততির সংখ্যা, জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই পরিকল্পিত প্রশ্নমালার মধ্যে পড়ে এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হতে পারে না।

পরিকল্পিত প্রশ্নমালাকে আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যাদের আবদ্ধ (closed-form) ও উন্মুক্ত (open-end) প্রশ্নমালা বলা যেতে পারে। প্রথমটিতে এমন প্রশ্ন করা হয়, যেগুলির বিকল্প উত্তরের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এটি দুটি হতে পারে : (১) যেখানে 'হ্যাঁ' বা 'না' ছাড়া কোনও বিকল্প উত্তর থাকা সম্ভব নয় এবং (২) যেখানে উত্তরদাতাকে এক সীমিতসংখ্যক উত্তর থেকে নিজের উত্তরটিকে বেছে নিতে হয়। দ্বিতীয়টি অবশ্য উত্তরদাতাকে তাঁর নিজস্ব ভাষা শৈলী, ধারণা প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। এই ধরণের প্রশ্নমালা সচরাচর তন্নিষ্ঠ বা পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কিছু কিছু উত্তরদাতা অবাধ, অর্থহীন উত্তর দেওয়ার ফলে এ ক্ষেত্রে যথাযথ শ্রেণী বিভাজন, সারণিকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অপরিকল্পিত প্রশ্নমালাতে প্রশ্নগুলি আগে থেকে প্রস্তুত করা হয় না এবং পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করা হয়। এতে বিভিন্ন ধরণের উত্তর দেবার সুযোগ থাকে। এই ধরণের প্রশ্নমালা প্রধানত সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। নমনীয়তা এই প্রশ্নমালার অন্যতম গুণ। উত্তরদাতার কাছ থেকে সম্ভাব্য সব রকমের তথ্য সংগ্রহ করাই এর লক্ষ্য।

শিশু ও নিরক্ষর মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বহু ক্ষেত্রে সচিত্র প্রশ্নমালাও ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ ও ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ার ফলে অবশ্য এ ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

১.৩ প্রশ্নমালা গঠন

কোনও প্রশ্নমালাই সম্পূর্ণ নিখুঁত না হলেও গবেষণার অভিজ্ঞতা ও সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে মোটামুটি উচ্চ মানের প্রশ্নমালা গঠন করা সম্ভব।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতির সময়ে প্রথমেই তার বাহ্যিক রূপের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বাহ্যিক চেহারাটি

আকর্ষণীয় হলে সেটি উত্তরদাতার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের সঞ্চার করে। পউলিন ইয়ঙ মনে করেন যে, প্রশ্নমালা গঠনের সময়ে নীচের বিষয়গুলি বিবেচনা করা আবশ্যক :

১. তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পরিচয়-ফর্মের সম্মুখভাগে একটি নজরকাড়া অবস্থানে থাকা উচিত। ডাকে ফর্ম ফেরত দেবার ব্যবস্থা করলে ঠিকানার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত।

২. গবেষণার বা সমীক্ষার শীর্ষনাম সামনের পাতায় বড় হরফে থাকা উচিত। ফর্মের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলিতে বিশেষ হরফ বা অন্য কিছু ব্যবহার করা উচিত।

৩. তথ্যসংগ্রহের ভিত্তি ও অধিকার সম্পর্কে ফর্ম জানানো উচিত।

৪. তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত যাতে উত্তরদাতা নিজেকে সুরক্ষিত বোধ করতে পারেন।

৫. প্রতিবেদনটি যে সময়কালের জন্য, ফর্মে আগেই তা উল্লেখ করা উচিত, বা পরে উল্লেখ করার জন্য জায়গা ছেড়ে রাখা উচিত।

৬. পাদটীকার প্রয়োজন হলে তার জন্য সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট জায়গা রাখা উচিত।

৭. যদি না তা অপ্রয়োজনীয় হয়, তাহলে উত্তরদাতার স্বাক্ষরের জন্য জায়গা রাখা উচিত।

৮. প্রতিটি প্রশ্নমালাকে ক্রমিক সংখ্যার সাহায্যে চিহ্নিত করা উচিত যাতে কাজের সুবিধা হয়।

৯. প্রশ্নমালাতে একাধিক পাতা বা পৃষ্ঠা থাকলে প্রতিটি পৃষ্ঠাকে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা উচিত। সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারীর অতিরিক্ত ফর্ম ব্যবহার করা প্রয়োজন হলে ব্যবহৃত প্রতিটি ফর্ম চিহ্নিত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল গবেষণার ক্ষেত্রটির পরিচয় দেওয়া এবং জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলি স্থির করা। সম্ভাব্য যে-কোনও ধরণের প্রশ্নকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতাকে ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ "দীর্ঘ ও অসংলগ্ন প্রশ্নমালা প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা উভয়কেই সমস্যায় ফেলে। এর ফলে প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য কোনও অবস্থাতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়।" পউলিন ইয়ঙ বলেন যে, "প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা হলেও সেটিই বিবেচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত নয়। প্রশ্নমালাতে বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কি না এবং গৃহীত পদ্ধতিগুলি গবেষণার দাবী পূরণ করছে কিনা, সেটাই বিবেচনার মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত।"

প্রশ্নমালাতে প্রতিটি বিষয় এমন ভাবেই উপস্থাপিত করা উচিত যে, তা উত্তরদাতার উপলব্ধির সঙ্গে খাপ খায়। দীর্ঘদিন আগে ঘটে-যাওয়া কোনও ঘটনা যা স্মরণ করা কঠিন, অথবা তাঁর পক্ষে বোঝা কঠিন এমন কোনও বিষয়, অথবা ব্যক্তিগত বা আবেগপ্রবণ বিষয়গুলি সম্পর্কে উত্তরদাতার মতামত প্রার্থনা করা উচিত নয়।

উত্তরদাতার জ্ঞানের মান সম্পর্কে কোনও অবাস্তব ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। সাধারণভাবে, উত্তরদাতার সম্পর্কে কোনও পূর্বনির্ধারিত ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা উচিত নয়। তাঁদের এই রকম কোনও ধারণা থাকা ঠিক নয় যে, গবেষণার বা সমীক্ষার বিষয়ে উত্তরদাতা অবধারিত ভাবেই কিছু জ্ঞানের অধিকারী বা একই বিষয়ে কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িত।

প্রশ্নমালার শব্দসম্ভার ও বাক্যগঠন এমন হওয়া উচিত, যা প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার মধ্যে ধারণার আদানপ্রদানকে সম্পূর্ণ ও ত্রুটিহীন করে তুলতে সহায়ক হবে।

কোনও উচ্চ মানের প্রশ্নমালা গঠনের সময়ে জনসমষ্টির গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারিগরি বা বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ বাদ দিয়ে সাধারণ, প্রাত্যহিক কথোপকথনের সময়ে ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। কোনও কঠিন শব্দের বিকল্প থাকলে সেটিকেই ব্যবহার করা উচিত।

সাধারণ মানুষের উপর গবেষণামূলক সমীক্ষা চালানোর সময় প্রশ্নের ভাষা সহজ হওয়া উচিত, যাতে প্রশ্নের সঠিক অর্থ বোঝানো যায়। জটিল ও বহুদিক-সমন্বিত বিষয়ের ক্ষেত্রে জটিল প্রশ্ন রাখার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতা দমন করে একটি জটিল প্রশ্নের বদলে অনেকগুলি সহজ প্রশ্ন রাখাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নের গঠন এমন হওয়া উচিত যা উত্তরদাতাকে সম্ভাব্য বা যথাযথ উত্তর সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত না দেয়। এমন সব প্রশ্ন এড়িয়ে চলা উচিত যেগুলি নির্দিষ্ট কোনও উত্তর দিতে উত্তরদাতাকে প্রভাবিত করে।

সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য বা বাঞ্ছনীয় নয়, এমন উত্তর দিতে উত্তরদাতাদের বাধ্য করা উচিত নয়। যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে একটিই ধারণা জড়িয়ে থাকা উচিত।

প্রশ্নমালাতে প্রশ্নের বিন্যাস এমনই হওয়া উচিত যাতে তা উত্তরদাতার কাছে সহজেই বোধগম্য হয়। প্রথম প্রশ্নগুলি উত্তরদাতার মনে আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারলে তিনি নিজেই পরবর্তী প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করবেন। প্রশ্নগুলিকে সাজানো উচিত "ফানেল পদ্ধতির" (Funnel Method) সাহায্যে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে সাধারণ, প্রশস্ত কিছু প্রশ্ন রেখে পরবর্তী স্তরগুলতে সংকীর্ণ ও নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি রাখা হয়।

নাম প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক না হলে বহু উত্তরদাতা খোলা মনে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে প্রশ্নকর্তাদের যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা উচতি।

প্রশ্নমালা প্রস্তুত করার সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না লক্ষ্য রাখা উচিত। গবেষক নিজেই তাঁর নজর-তালিকা (check list) প্রস্তুত করতে পারেন অথবা নমুনা কোন নজর-তালিকার সাহায্য নিতে পারেন। গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী এই তালিকা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এখানে আমরা পউলিন ইয়ঙ কৃত নজর-তালিকার সংক্ষিপ্ত রুপ পেশ করছি :

১.৪ প্রশ্নের বিষয়

স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য এই প্রশ্নের কী প্রয়োজন আছে? এই প্রশ্নকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে?

এই প্রশ্নের বিষয়টির উপর কী অনেকগুলি প্রশ্নের প্রয়োজন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার উপযুক্ত তথ্য কী উত্তরদাতার আছে?

প্রশ্নটি কী আরও নির্দিষ্ট ও উত্তরদাতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত?

প্রশ্নের বিষয়টি কী যথেষ্ট সাধারণ এবং মিথ্যা সুনির্দিষ্টতা থেকে মুক্ত?

প্রশ্নের বিষয়টি কী পক্ষপাতদুষ্ট বা বিশেষ এক দিকে ঝুঁকে পড়া, ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সহযোগী প্রশ্নের প্রয়োজন আছে কী।

প্রশ্নের শব্দচয়ন

প্রশ্নগুলির শব্দ নির্বাচন কী দুরূহ যাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়?

উত্তর নির্বাচনের প্রসঙ্গে প্রশ্নগুলি কী বিকল্পগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা দেয়?

কিছু অকথিত ধরাণা ও অদেখা তাৎপর্যের জন্য প্রশনগুলি ভুল পথে চালিত করে না তো?

শব্দগুলি কী উত্তরদাতাদের কাছে আপত্তিজনক মনে হতে পারে?

আরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে প্রশ্নটিকে কী আরও ভাল ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে?

১.৫ প্রশ্নের বিন্যাসক্রম

আগের প্রশ্নের বিষয়টি কী পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তরকে প্রভাবিত করতে পারে?

প্রশ্নগুলির বিন্যাস কী স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করেছে? তারা কী সঠিক মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস মেনে চলছে?

কিছু প্রশ্ন কী আগ্রহ জাগানোর ক্ষেত্রে অনেক আগে বা অনেক পরে এসেছে?

যোলটি নির্দেশ : 'হ্যাণ্ডবুক অফ রিসার্চ ডিজাইন অ্যাণ্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট' গ্রন্থে ডেলবার্ট সি. মিলার প্রশ্নমালা গঠনের জন্য যোলটি নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলি হল :

১. উত্তরদাতার জ্ঞান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করা উচিত।
২. এমন শব্দ নির্বাচন করুন যা সকলের কাছে একই অর্থ বহন করে।
৩. দীর্ঘ প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন।
৪. আগে থেকেই ধরে নেবেন না যে উত্তরদাতার কাছে প্রকৃত তথ্য আছে বা তাঁর নিজস্ব মতামত আছে।
৫. নিজের দৃষ্টিকোণকে প্রতিষ্ঠা করুন।
৬. প্রশ্ন গঠন করার সয়ে উত্তরদাতাকে হয় সবকটি সম্ভাব্য বিকল্প জানান কিংবা একটিও বিকল্প জানানো থেকে বিরত থাকুন।
৭. উত্তরদাতার আত্মমর্যাদা রক্ষা করুন।
৮. কোনও অপ্রীতিকর উত্তর আশা করলে উত্তরদাতাকে প্রথমে তাঁর ইতিবাচক চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করতে দিন যাতে তিনি কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন না হন।
৯. সিদ্ধান্ত নিন প্রশ্নটি আবদ্ধ না উন্মুক্ত হবে।
১১. সিদ্ধান্ত নিন প্রশ্নটি সাধারণ, না কী নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।
১২. দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দ এড়িয়ে চলুন।
১৩. পক্ষপাতদুষ্ট প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন।
১৪. এমন ভাষায় প্রশ্ন করুন যাতে সেগুলি বিনা প্রয়োজনেই আপত্তিজনক না হয়ে ওঠে।
১৫. সিদ্ধান্ত নিন ব্যক্তিগত বা নৈর্ব্যক্তিক, কোন ধরণের প্রশ্ন বেশী উপযোগী হবে।

১৬. কোনও একটি ধারণা বা প্রসঙ্গের মধ্যেই প্রশ্নটিকে সমাবদ্ধ রাখা উচিত।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক সূত্রের সাহায্যে প্রশ্ন গঠন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বিকল্প প্রশ্ন ব্যবহার করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালনো প্রয়োজন, কারণ কড়া নিয়মকানুনের অনুপস্থিতিতে প্রশ্নমালা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষানিরীক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রাক-পরীক্ষা (pre-tests)

সাক্ষাৎকারের তুলনায় ডাকে পাঠানো প্রশ্নমালার উত্তর অনেক কম পাওয়া যায়। সাধারণত অল্পশিক্ষিত, নীচু স্তরে বৃত্তিতে জড়িত ও বিষয়টি সম্পর্কে অনাগ্রহী মানুষদের মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা যথেষ্ট কম হয়। এই সংখ্যা বাড়ানোর সব থেকে ভাল পদ্ধতি হল অনুসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অর্থাৎ উত্তরদাতাদের আবার নতুন করে তাগিদ দেওয়া উত্তর দিতে অনিচ্ছুক মানুষের হার এমন স্তরে নামিয়ে আনা উচিত যাতে সমীক্ষাটি পক্ষপাতদুষ্ট বা বিকৃত না হয়ে ওঠে।

বিশুদ্ধতা ও গ্রহণীয়তা

প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্বস্ততা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। প্রধানত দুটি উপায়ে এই পদ্ধতির বিশ্বস্ততা যাচাই করা যেতে পারে :

(১) একই প্রশ্নমালা একই উত্তরদাতাকে কিছু সময়ের ব্যবধানে আবার পাঠানো যেতে পারে। দুবারই উত্তর একই ধরণের পাওয়া গেলে প্রশ্নমালাটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(২) দুটি ভিন্ন ভিন্ন নমুনার ক্ষেত্রে একই প্রশ্নমালা ব্যবহার করা যেতে পারে। উত্তরগুলির শতকরা হার ও প্রকৃতি একই রকম হলে ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একই ধরণের হলে একে বিশ্বস্ত মনে করা যেতে পারে।

মানুষ যেহেতু সময় ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পালটায়, সেহেতু এই দুই পদ্ধতিকে নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে না। অবশ্য জীবন ও সমাজের পরিবর্তন সত্ত্বেও এই পদ্ধতি দুটিকে মোটামুটি কার্যকর বলা চলে।

১.৬ প্রশ্নমালার সুবিধা

১. অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এটি কম ব্যয়সাপেক্ষ। উত্তরদাতারা কম সংখ্যায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকলে এবং আর্থিক সামর্থ্য সীমিত হলে, ডাকে প্রশ্নমালা পাঠানো হল সবথেকে উপযোগী পদ্ধতি।

২. ডাকে প্রশ্নমালা পাঠিয়ে উত্তর সংগ্রহ করলে সমীক্ষার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে।

৩. প্রশ্নমালা ব্যবহার করলে প্রশ্নকর্তার নিজস্ব উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। প্রশ্নমালাতে দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী উত্তরদাতা নিজেই ফর্মটি ভর্তি করতে পারেন।

৪. প্রশ্নমালা স্বভাবতই এক ব্যক্তিনিরপেক্ষ দলিল।
৫. প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতা নিজের নাম গোপন রাখতে পারেন। এর ফলে তিনি খোলা মনে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। এই কারণে প্রশ্নমালা সাক্ষাৎকারের তুলনায় বেশী উপযোগী।
৬. প্রশ্নমালা উত্তরদাতার উপর কোনও আবেগজনিত চাপ সৃষ্টি করে তোলে না। উত্তর দেবার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সময় ও স্বাধীনতা পান। এর ফলে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিতে সক্ষম হন।
৭. অপরিচিত প্রশ্নকর্তার মুখোমুখি না হয়ে অকেকেই এই পদ্ধতিতে আগ্রহের সঙ্গো ব্যক্তিগত ও অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলরি উত্তর দিয়ে থাকেন। এর ফলে প্রশ্নমালা আমাদের কাছে আরও বাস্তব এক চিত্র হাজির করতে সক্ষম হয়।
৮. প্রশ্নমালা অপরিচয়জনিত সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

১.৭ প্রশ্নমালার অসুবিধা বা সীমাবন্ধতা

১. অধিকসংখ্যক উত্তরদাতার প্রয়োজন হলে প্রশ্নমালা পদ্ধতি ততটা উপযোগী নয়।
২. আয়, যৌন আচরণ, অস্বাভাবিক কাজকর্ম ইত্যাদি ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা যথেষ্ট উপযোগী নয়, কারণ উত্তরদাতারা সাধারণত এই সব প্রশ্নের উত্তর জানাতে অনিচ্ছুক থাকেন।
৩. প্রশ্নগুলি সহজ ও সোজাসুজি না হলে প্রশ্নমালা অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করতে পারেনা।
৪. সমীক্ষার কাজে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকলে প্রশ্নমালা পদ্ধতি যথেষ্ট নয়।
৫. প্রশ্নমালার উত্তরগুলি যাচাই করে নেওয়া এবং চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া যায় না। ডাকে পাঠানো প্রশ্নমালা কার্যত এক অনমনীয় পদ্ধতি।
৬. স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর পেতে হলে প্রশ্নমালা ঠিক উপযোগী নয়।
৭. অন্যদের সঙ্গো আলোচনা বা কথোপকথনের প্রভাব থেকে মুক্ত শুধু একজন ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকর নয়।
৮. উত্তরদাতার জ্ঞানের স্তর সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য প্রশ্নমালা সঠিক পদ্ধতি নয়।
৯. প্রশ্নমালা হাতে পেলে উত্তর দেবার আগে উত্তরদাতা সাধারণত সম্পূর্ণ প্রশ্নমালাটিই একবার পড়ে ফেলেন। কাজেই উত্তরগুলি একে অপরের প্রভাবমুক্ত বলে মনে করা যায় না।
১০. যাঁর উদ্দেশে প্রশ্নমালাটি পাঠানো হয়েছে, তিনি নিজেই যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তাঁর হয়ে অন্য কারুর উত্তর দেবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণই নস্যাৎ করে দেওয়া যায়না।
১১. প্রশ্নমালা তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গো সমন্বিত উপায়ে কাজ করার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সঙ্গো সমন্বয় ঘটিয়ে প্রশ্নমালার কিছু কিছু অসুবিধা দূর করা সম্ভব।

২.০ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

যে কোনও গবেষণা বা প্রকল্পে তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী পর্যায়ে আসে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য বিশ্লেষণের কাজ।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বলতে তথ্যকে ঘনীভূত করা, পুনর্বিন্যাস করা ও নতুন ভাবে সংঘবদ্ধ করা বোঝায় যা তথ্য বিশ্লেষণের কাজকে অনেক সহজ করে তোলে। তথ্য বিশ্লেষণ হল প্রকল্প বা গবেষণার প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যের পর্যবেক্ষণ করা ও যত দূর সম্ভব প্রচলিত তাত্ত্বিক সূত্রগুলরি কাছে দায়বন্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ অনেকটাই নির্ভর করে তথ্যের প্রকৃতির উপর। প্রক্রিয়াকরণ গুণগত বা পরিমাণগত- এই দুই ধরণেরই হতে পারে। তথ্য মৌখিক হলে তাকে সংখ্যাগত রূপ দেওয়া প্রয়োজন হয়, যাতে তার সম্পর্কে আরও ভালভাবে ধারণা তৈরী করা সম্ভব হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সময় যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সেটি হল তথ্যের প্রকৃতি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক।

গবেষণার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে যদি আগেই ভালভাবে পরিকল্পনার রচনা করে নেয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতের অনেক সমস্যা এড়িয়ে দ্রুত গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি চরিত্র ও সংখ্যা, প্রকল্প বা প্রকল্পগুলির জটিলতা, উত্তরদাতার সংখ্যা ও সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা রচনা করা যেতে পারে। সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণ সামান্য হলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ হাতেহাতেই করা সম্ভব। কিন্তু তথ্যের পরিমাণ ও জটিলতা বৃদ্ধি পেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও কমপিউটার ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়। আর্থিক ব্যয়ের দিকটি বিবেচনা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তর : এখানে মূলত সুপরিকল্পিত প্রশ্নমালার সাহায্যে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণা সমীক্ষার দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের প্রসঙ্গোই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরণের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে : (১) সম্পাদনা (২) তথ্যকে সংখ্যাগত রূপ দেওয়া (coding) ও (৩) সারণিবন্ধকরণ (tabulation) ।

২.১ সম্পাদনা

প্রশ্নকর্তা যথেষ্ট জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হলেও প্রশ্নমালাতে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন, প্রশ্নমালাতে কিছু ফাঁক থেকে যেতে পারে বা প্রশ্নগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যেতে পারে। এই ধরণের ত্রুটি দূর করার জন্য য-শীল সম্পাদনা অপরিহার্য।

অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা কোনও একটি প্রশ্ন করতে ভুলে যান বা কোনও উত্তর নথিবন্ধ করেন না। দুটি ক্ষেত্রেই উত্তরদাতাকে আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে। একই উত্তরদাতা অন্য কোনও প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা থেকে যদি অনুপস্থিত উত্তরটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়, তাহলে তার সাহায্যেও ওই শূন্যস্থান পূর্ণ করা যেতে পারে। কোনও উত্তরের স্থানটি শূন্য রাখার থেকে আবার প্রশ্ন করে সেই

উত্তরটি সংগ্রহ করাই বাঞ্ছনীয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আবার প্রশ্ন করে পাওয়া উত্তরগুলি লক্ষ্য করা উচিত, যাতে সম্পাদনার কাজে সম্ভাব্য অসংগতিগুলি চিহ্নিত করা যায়।

প্রশ্নকর্তার দক্ষতায় পূর্ণ আস্থা থাকলে সমস্ত প্রশ্নমালার পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে নেওয়া উচিত এবং তাতে যদি কোনও ত্রুটি ধরা না পড়ে, তাহলে পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ কোডিঙের প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

এই যাচাই প্রক্রিয়ার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে : পূর্ণতা, সংগতি বা সামঞ্জস্য এবং সুষমতা (regularity)।

পূর্ণতা (completeness) : প্রথমেই দেখা প্রয়োজন প্রশ্নমালাতে সব প্রাসঙ্গিক তথ্য নথিবদ্ধ হয়েছে কী না অর্থাৎ সব কটি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা গেছে কী না। কখনও কখনও কোনও উত্তরদাতা তিনি কোন দলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন তা জানাতে অস্বীকার করেন। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা কোনও একটি প্রশ্ন করতে ভুলে যান বা কোনও একটি উত্তর নথিভুক্ত করেন না। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করলে এই ধরণের ত্রুটিগুলি এড়ানো সম্ভব হয়। যেমন কোনও উত্তরদাতা তাঁর লিঙ্গের উল্লেখ না করলে তাঁর নাম থেকে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। উত্তরদাতার পক্ষে প্রযোজ্য নয় এমন প্রশ্ন করা হলে সেখানেও শূন্য স্থান থাকা স্বাভাবিক। সম্পাদনার পর্যায়ে উত্তর না পাবার কারণগুলি চিহ্নিত করা কঠিন। সেই কারণে প্রশ্নকর্তার উচিত যে সব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা যায়নি সেগুলির উপর যথাযথভাবে দৃষ্টি দেওয়া।

উন্মুক্ত (open-ended) প্রশ্নগুলির উত্তরেরও সতর্ক যাচাই প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সচরাচর সমস্যা দেখা দেয় উত্তরের বোধগম্যতা নিয়ে। দ্রুত কাজ সেরে ফেলার জন্য প্রশ্নকর্তা অনেক সময় ধৈর্য হারান এবং অস্পষ্টভাবে উত্তরগুলি নথিবদ্ধ করেন। ব্যাকরণ বা বাননের ভুল ঢাকতে গিয়ে প্রশ্নকর্তা নিজেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিজিবিজি লেখার আশ্রয় নেন। এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার উচিত নিজে উত্তরগুলি পড়ে শোনানো। প্রশ্ন করা ও সম্পাদনার মাঝে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে প্রশ্নকর্তার পক্ষে নিজের লেখার অর্থ বের করাও কঠিন হয়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন করাই সবথেকে ভাল উপায়।

অসংগতি : কখনও কখনও উত্তরদাতার উত্তরগুলিতে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার প্রশ্নগুলিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হয়। সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে এই ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা যায়। নিরক্ষর উত্তরদাতারা মাঝে মাঝে অসংলগ্ন উত্তর দিয়ে থাকেন। এই সব ক্ষেত্রে উত্তরগুলির গঠন পরিবর্তন করার কোনওরকম প্রয়াস করা বাঞ্ছনীয় নয়।

সুষমতা : সুষমতা বলতে মূলত প্রশ্ন করা ও উত্তর নথিবদ্ধ করার পদ্ধতিগুলিকে বোঝায়। প্রশ্ন করার পদ্ধতি সুষম হওয়া খুবই জরুরী, কারণ এর উপরেই নির্ভর করে উত্তরের সুষমতা। উত্তরগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে প্রশ্ন করার পদ্ধতির মধ্যে পক্ষপাত বা প্রভেদগুলি টের পাওয়া সম্ভব হয়।

যেমন,

১. ধূমপান সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মত আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে ধূমপান করা ভাল, আবার কেউ কেউ একে ক্ষতিকর বলে মনে করেন। এই বিষয়ে আপনার মত কী?

২. আপনার কী মনে হয়না যে ধূমপান করা খারাপ?

প্রকৃত উত্তর জানতে হলে প্রথম প্রশ্নটিই করা উচিত। প্রশ্নকর্তা দ্বিতীয় প্রশ্নটি বেছে নিলে তার উত্তর

পক্ষপাতদুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরণের ত্রুটি এড়িয়ে চলতে প্রশ্নমালাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োনজন। প্রশ্নকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও নির্দেশ দিয়ে কোনও বড় ধরনের ত্রুটি সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব।

উত্তরদাতাদের আয়-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রেও সুষমতার সমস্যা দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর উত্তরদাতারা এর উত্তরে তাঁরা কতটা ফসল পান সেটাই উল্লেখ করেন, কিংবা তাঁদের দৈনিক, মাসিক বা বাৎসরিক মজুরির কথা জানান। উত্তরদাতারা মাপের সে সব এককের কথা উল্লেখ করেন সেগুলির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। এখানে প্রশ্নকর্তাকে নিজেই অঙ্ক করে বের করতে হয় উত্তরদাতার মাসিক, বা বাৎসরিক আয় কত। উত্তরদাতাদের দেওয়া উত্তরগুলিকে মূল কার্যালয়ে বসে ধীরেসুস্থে পরীক্ষা ও হিসাব করাই সবথেকে ভাল উপায়।

কোডিঙ (তথ্যকে সংখ্যাগত রূপ দেওয়া)

সম্পাদনার পরে প্রক্রিয়াকরণের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল কোডিঙ বা গুণগত তথ্যগুলিকে সংখ্যাগত রূপ দেওয়া। বিপুল পরিমাণ তথ্য নিয়ে কাজ করা এই পদ্ধতিতে অনেক সহজ হয়ে যায় এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ আরও দ্রুত ও সুমন্ধভাবে সম্পন্ন করা যায়।

যেসব সমীক্ষায় ফলাফলকে পরিমাণগত রূপে দেখানো প্রয়োজন হয়, সেই সব ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী একটি পর্যায় হল উত্তরগুলির কোডিঙ। কখনও কখনও একে এবং প্রাথমিক সম্পাদনাকে একই কর্মকাণ্ডের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

কোডিঙের উদ্দেশ্য হল কোনও একটি প্রশ্নের উত্তরগুলিকে অর্থপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজিত করা। এই পদ্ধতির দুটি স্বতন্ত্র পর্যায় আছে। প্রথমটি হল ব্যবহার করার শ্রেণীগুলিকে বেছে নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল উত্তরগুলিকে যথাযথ শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। শ্রেণীগুলির স্তবককে 'কোডিং ফ্রেম' বলে উল্লেখ করা হয়। প্রশ্নমালা থেকে সংগৃহীত সমস্ত তথ্যের সারাৎসার যে সব কোডিঙ ফ্রেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেগুলির স্তবককে সাধারণত 'কোড বুক' বলা হয়।

কোডিঙ ফ্রেম : কোডিঙ ফ্রেম জড়িত থাকে কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঙ্গে। প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যা যদি খুবই কম হয়, তাহলে এই ফ্রেম গঠন করায় কোনও সমস্যা দেখা দেয় না। "আপনি কী আজ একটিও সিগারেট খেয়েছেন?" প্রশ্নটির উত্তর হতে পারে : "হ্যাঁ", "না", এবং এগুলির সঙ্গে থাকতে পারে "মনে করতে পারছি না", "উত্তর দেবনা", প্রযোজ্য নয়।" অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফ্রেম গঠন করাতে কোনও অসুবিধা হয় না কারণ তা নিজে থেকেই গঠিত হয়ে যায়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে ফ্রেম নিজে থেকেই গঠিত হয়না, সেখান বিচার করতে হয় কোডিঙে কতগুলি গোষ্ঠী বা গুচ্ছ থাকবে, যা আবার নির্ভর করবে উত্তরগুলির বন্টনের সম্ভাবনার উপর এবং কী ধরণের বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে তার উপর।

যেমন, উত্তরদাতা বাড়ীতে থাকলে কী ধরণের বাড়ীতে থাকেন?

সম্পূর্ণ খড় দিয়ে ছাওয়া বাড়ী ৫

আধা খড় দিয়ে ছাওয়া বাড়ী ৬

সম্পূর্ণ বারান্দা সমন্বিত বাড়ী ৭

স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বাড়ী ৮

অন্যান্য ৯

প্রযোজ্য নয় Y

এটা ধরে নেওয়া হয় যে এগুলি সমস্তত বিকল্প উত্তরের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের স্বতন্ত্র রাখা সুবিধাজনক। ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক কোডগুলিকে মিলিয়ে এক 'সম্পূর্ণ বাড়ী' কোডের আওতায় আনা যেত, কিন্তু এই তিনটির বিভাজনও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। মোটামুটি ভাবে এ কথা বলা হয় যে, কারণ পরে বিশ্লেষণের সময় এটিই উপযোগী প্রমাণিত হয়। আবার পাঞ্চড কার্ড বা কমপিউটার ব্যবহার করতে গেলে বেশী খুঁটিনাটি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। কোডিঙের মূল লক্ষ্য হল তথ্যের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া, কাজেই খুব বেশী বা খুব কম, দু ধরণের শ্রেণীবিভাজনই অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

উত্তরের কোডিঙ : উত্তরগুলিকে কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ উত্তরদাতাই করে ফেলতে পারেন, যখন প্রশ্নকর্তা প্রশ্নগুলির জন্য নির্দিষ্টভাবে বাছাই করা উত্তরের একগুচ্ছ তাঁকে সরবরাহ করেন। একই ঘটনা ঘটতে পারে অফিস কোড বা সরাসরি কোড সংবলিত প্রশ্নগুলির উত্তরের ক্ষেত্রেও প্রথম দুটি দৃষ্টান্তে আগে থেকে কোড দেওয়া প্রশ্ন সরবরাহ করা হয় এবং প্রশ্নকর্তাকে (ডাকে প্রশ্নমালা পাঠানোর ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে) শুধুমাত্র (স্রেফ টিক্ চিহ্ন দিতে বা উত্তরের নীচে রেকা টানার মত কাজ করতে হয়।

তৃতীয় ধরণের কোডিঙের প্রয়োজন হয় যখন কোনও উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব আক্ষরিকভাবে নথিবদ্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে অফিস বা কার্যালয়ে কোডিঙ করা হয়। কোডিঙের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে দেখতে হয় উত্তরটি বিশেষ কোনও উপাদানের (যেমন সাধারণভাবে জীবন ধারণের ব্যয়) সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কী না, অথবা প্রসঙ্গটির গুরুত্ব বা উত্তরের বিভিন্ন বক্তব্য অনুযায়ী তাকে অনেকগুলির মধ্যে কোনও একটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

সারণিবন্ধকরণ

বেশীর ভাগ সমীক্ষাতেই সম্পাদনা ও কোডিঙ হয়ে যাবার পরবর্তী পর্যায়ে তথ্যকে কোনও ধরণের সারণিতে স্থাপন করা হয়। সারণিবন্ধ করার জন্য বিশেষ কোনও কৌশলের বা দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে মূল কাজ হল প্রতিটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে কতগুলি উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাই গণনা করা। সম্পাদনা ও কোডিঙের সাহায্যে তথ্যের অভ্রান্ততা ও যথার্থ শ্রেণীবিভাজনে সুনিশ্চিত করার পর বাকী থাকে সর্বসাকুল্যে কোনও প্রশ্নের উত্তর কত জন 'ক' কতজন 'খ' দিয়েছেন, তা গণনা করা।

যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই এই কাজ করা সম্ভব। হাতের সাহায্যে সারণি প্রস্তুত করা অতি সরল এবং কম শ্রমসাধ্য কাজ। কেউ যদি বৃত্তি অনুযায়ী আয়ের বন্টনের একটি বিশ্লেষণ চান তাহলে যা করা প্রয়োজন হল এই দুই পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির একটিকে অনুভূমিক এবং অন্যদিকে উল্লম্ব ভাবে উপস্থাপিত করা। স্বল্প আয়তনের সমীক্ষার জন্য যন্ত্রের সাহায্যে সারণিবন্ধকরণের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কোনও জটিল সমীক্ষার

ক্ষেত্রে, যেখানে পরিবর্তনশীল উপাদানের সংখ্যা দুইয়ের বেশী, সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে ছাড়া সারণিবন্ধ করণের কাজ কঠিন।

৩.০ তথ্যবিশ্লেষণ

গবেষণার সবকটি পর্যায়ের মধ্যে তথ্যবিশ্লেষণ সব থেকে বেশী দক্ষতা দাবী করে। এই কাজে গবেষকের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অন্য কারুর উপর দায়িত্ব না দিয়ে গবেষকের উচিত নিজেই এই কাজটি করা। যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় সমীক্ষার প্রেক্ষাপট ও তার প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। বিশ্লেষণের জন্য পরিমাণগত বা অন্য পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্য বিশ্লেষণের পদক্ষেপগুলি গবেষণার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। গবেষণার প্রারম্ভে যদি স্পষ্টভাবে সূত্রায়িত প্রকল্পের একটি গুচ্ছ থাকে, তাহলে প্রতিটি প্রকল্পকে তথ্যসম্পর্কে নেওয়া কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবার কাজ হিসাবে ভাবা যেতে পারে। প্রকল্প যত নির্দিষ্ট হবে, পদক্ষেপও তত নির্দিষ্ট হবে। এই ধরণের গবেষণায় বিশ্লেষণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে এক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়। তখন বিশ্লেষণের কাজ হয়ে দাঁড়ায় শুধু তথ্যের যথাযথ মিশ্রণটি সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে প্রকল্পগুলির সত্যতা ভ্রান্ততা যাচাই করার নির্দেশগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে নেওয়া।

বিশ্লেষণের অংশ হল সংখ্যাতাত্ত্বিক বন্টন নির্ণয় করা, নকশা প্রস্তুত করা, এবং গড়, শতকরা হার ইত্যাদি সহজ হিসাব করা. অর্থাৎ সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমীক্ষা বিশ্লেষণের এক অঙ্গ। অনেকগুলি আংশিক পরিবর্তনশীল উপাদানের সম্পর্কে স্থাপন ও ব্যাখ্যার তাগিদেই সমীক্ষাতে জটিল সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশ্লেষণের অর্থ প্রকল্পগুলি যাচাই করা। আদর্শ পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ তেমন সমস্যার মুখোমুখ হয় না, কারণ প্রকল্পের বক্তব্য ও পরীক্ষামূলক নকশার বিশদীকরণ নিজে থেকেই বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে।

তথ্য বিশ্লেষণ যে সমস্যাগুলি সৃষ্টি করে সেগুলি প্রত্যেকটিই প্রকল্প বা প্রকল্পগুলির জটিলতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবশ্য দুটি দিক আছে, যার ফলে এই ধরণের আদর্শ পরিস্থিতি সব সময় পাওয়া যায়না। এদের প্রথমটি হল সংগতিহীন পরীক্ষালব্ধ সুষমতার উপস্থিতি ও দ্বিতীয়টি হল আশানুরূপ সুষমতার অনুপস্থিতি। এই সব ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক নকশা অনুসরণ করে বিশ্লেষণের কাজটি করা সম্ভব হয় না এবং অন্য পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে এক উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যকে অন্য সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করার। দুটিকেই আমরা আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণ বলতে পারি। পরীক্ষানিরীক্ষার অতি 'বিশুদ্ধ' দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই ধরণের বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলিকে 'আপাত-সমীচীন' (plausible) বলা গেলেও বিজ্ঞানের ভাষায় 'সম্ভাব্য' (probable) বলা যায় না। তা সত্ত্বেও আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণ শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগীও।

বিশ্লেষণ সম্পর্কে দুই ধরণের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে একটি তথ্য উপস্থাপনার পদ্ধতি

নিয়ে এবং অন্যটি তাদের যুক্তিসঙ্গাত বিন্যাসের পদ্ধতি নিয়ে, যার মাধ্যমে প্রশ্ন করা ও উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে।

৩.১ সংখ্যাতাত্ত্বিক উপস্থাপনা

গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনার সহজতম পদ্ধতি হল সারণিবদ্ধকরণ। এর মূল উপাদান হল ফলাফলের সংক্ষিপ্তসারকে সংখ্যাতাত্ত্বিক সারণির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা। এর অর্থ হল একটি স্তম্ভে কোনও পরিবর্তনশীল উপাদানের বিভিন্ন মান অর্ন্তভুক্ত করা এবং অন্য একটি স্তম্ভে প্রতিটির পুনরাবৃত্তির হারকে অর্ন্তভুক্ত করা। একটি উপযোগী বারংবারতা বন্টন (frequency distribution) বা সরল সারণি প্রস্তুত করতে একমাত্র যে সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে সেগুলি তিনটি বিষয়ে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করার সঙ্গো সম্পর্কিত।

প্রথমত, বাঁ দিকের স্তম্ভটিতে যে সব বৈশিষ্ট্য বা মান অর্ন্তভুক্ত করা হবে সেগুলি পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র হতে হবে। একই সঙ্গো সেগুলিকে এমন হতে হবে যে, বিপুল পরিমাণ পর্যবেক্ষণও যেন তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলির সমাপতন বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সারণিবন্ধকরণের অভ্যন্তরীণ যুক্তি ও বিন্যাস থাকতে হবে। গুণগত ক্ষেত্রে বিন্যাস ততটা জরুরী না হলেও যুক্তির গুরুত্ব অপরিহার্য। সারণিবদ্ধকরণের সবকটি ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গাত কাঠামো না থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এক বিন্যাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যাকে এক বিশ্লেষণী নীতি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, বাঁ দিকের স্তম্ভে যদি কোনও পরিমাণগত পরিবর্তনশীল উপাদান রাখা হয়, তাহলে শ্রেণী ব্যবধান (class interval) নির্বাচনে সতর্ক থাকা উচিত। তথ্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষিত বিষয়গুলির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীব্যবধান স্থির করা বাঞ্ছনীয়। তথ্যকে যথার্থভাবে বোঝার জন্য স্বতন্ত্র উপাদানগুলিকে মানের উর্দ্ধমুখী বা নিম্নমুখী বিন্যাসে উপস্থাপিত করা হয়।

সাধারণভাবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, বিশ্লেষণের সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে সুপটু হস্তচালনার থেকে বড় ভূমিকা নেয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রয়োগ। গবেষণার নকশা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সঙ্গো যিনি সম্যক্‌ভাবে পরিচিত, সেই গবেষকের কাছে তাঁর তথ্যবিশ্লেষণ সেরকম সমস্যার সৃষ্টি করবে না।

৪.০ রিপোর্ট রচনা

গবেষণার রিপোর্ট লেখা বলতে বোঝায় কৃত গবেষণার সবকটি দিককে লিখিত ভাবে প্রকাশ করা। কোনও গবেষণা রিপোর্ট ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। রিপোর্টের মাধ্যমেই কোনও গবেষণার উৎকর্ষ সম্পর্কে মানুষ জানতে পারেন।

গবেষণা রিপোর্টের কাঠামো সচরাচর মনোগ্রাফের (একটি বা এক শ্রেণীর বিষয়ের উপর লিখিত নিবন্ধ)

কাঠামোর মত হয়ে থাকে। এ কথা তত্ত্বগত (academic) গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, যেখানে রিপোর্ট যথেষ্ট দীর্ঘ হয় এবং তাকে গবেষণাপত্র (thesis) বলা হয়।

রিপোর্টের কাঠামোকে সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। এই প্রধান ভাগগুলিকে আবার আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা যায়।

I. প্রাক-পত্র (preliminaries)

১. নামপত্র (title page)
২. মুখবন্ধ ও স্বীকৃতি (preface and acknowledgement)
৩. বিষয়সূচি (table of contents)
সারণি ও নকশার তালিকা
সংক্ষেপণের (abbreviation) তালিকা
শব্দপঞ্জী (glossary)
সংযোজনের তালিকা

II. রিপোর্টের মূল অংশ

ভূমিকা (যদি প্রয়োজন হয়)
৪. মূল পাঠ্যাংশ ও প্রামাণ্য তথ্য

III. শেষাংশ

৫. সংযোজন
৬. গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ নামপত্র

নাম পত্রের উপরে থাকে গবেষণার শিরোনাম ও মাঝে গবেষকের নাম। গবেষকের নাম থাকে এই ক্রমে—নাম, মধ্য নাম (যদি থেকে থাকে) ও পদবি এবং পূর্বে সংগৃহীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্থাৎ ডিগ্রী। এর নীচে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে থাকে উপরি-লেখ (Superscription) : "ডক্টর অফ ফিলজফি ডিগ্রীর জন্য (বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাপত্র জমা দেওয়া হল।" শেষে পাতার একদম নীচের দিকে জায়গার নাম ও তার নীচে গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার বছর।

নাম পত্রের নমুনা :

MODERN POETIC DRAMA with special reference to W. B. YEATS BY ADITYA KUMAR OHDEDAR, M.A. THESIS SUBMITTE TO THE BENARES HINDU UNIVERSITY, BENARES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY BENARES 1952

নাম পত্রের নমুনা কামরূপী উপভাষা : স্থানীয় রূপসমূহের এক তুলনামূলক অধ্যয়ন গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার অন্তর্গত পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত গবেষণা গ্রন্থ বিভা ভরালী অসমীয়া বিভাগ গৌহাটী, আসাম ১৯৯৮

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

৪.২ মুখবন্ধ ও স্বীকৃতি

একই বিষয়ে যদি পূর্বে গবেষণা হয়ে থাকে, তাহলে মুখবন্ধে সেগুলির একটি পর্যালোচনা থাকা উচিত যা থেকে সেগুলির সঙ্গো মতানৈক্য বা মতভেদগুলি স্পষ্ট হয়। বোঝা যায় আগের গবেষণাগুলির স্ববিরোধ ও অক্ষমতাগুলি কাটিয়ে কীভাবে বর্তমান গবেষণাটি উঠে এসেছে। গবেষণাতে নতুন কোনও দিশা উন্মুক্ত হলে বিশেষভাবে সেটির উল্লেখ করা উচিত যাতে গবেষণার গুরুত্ব ও জ্ঞানের জগতে সেটির অবদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গবেষণার সীমারেখার কথা বা কাজটি সম্পাদন করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

মুখবন্ধের শেষে স্বীকৃতিকে স্থান দেওয়া যেতে পারে, যদিও ইচ্ছা হলে তাকে স্বতন্ত্রভাবেও রাখা যায়।

৪.৩ বিষয়সূচী

বিষয়সূচীতে রিপোর্টের প্রধান অংশগুলির উল্লেখ থাকতে হবে : ১) ভূমিকা, ২) পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় এবং তাদের উপ-পরিচ্ছেদগুলি, ৩) সংক্ষেপণ ও শব্দপঞ্জী, ৪) সংযোজন। এগুলির প্রতিটি কোন কোন পাতায় আছে তা উল্লেখ করতে হবে। পাঠ্যাংশের ভিতর পরিচ্ছেদ ও তার শাখাগুলির উল্লেখ থাকলে সেগুলি যেন বিষয়সূচীতে দেওয়া নামগুলির সাথে মিলে যায়।

বিষয়সূচীর উদ্দেশ্য হল পাঠককে রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া এবং দ্রুত সেগুলি খুঁজে নিতে তাঁকে সাহায্য করা।

৪.৪ রিপোর্টের মূল পাঠ্যাংশ

এটিই গবেষণা রিপোর্টের প্রধান অংশ। এতেই অর্ন্তভুক্ত থাকে তথ্যের সংগঠন, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং একই সঙ্গো সংক্ষিপ্তসার ও উপসংহার।

মুখবন্ধে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া থাকলে এখানে পৃথক কোনও ভূমিকার প্রয়োজন নেই। মুখবন্ধ না থাকলে ভূমিকা অবশ্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আবার গবেষণার গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে মুখবন্ধে ভালভাবে উল্লেখ না করা হলে সেগুলির বিস্তারিত পরিচয় দেবার জন্যও ভূমিকার প্রয়োজন হয়। সংক্ষেপে বললে, মুখবন্ধ ও ভূমিকা দুই-ই থাকলে একে অপরের পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঠ্যাংশ হওয়া উচিত এমন এক আখ্যানের মত, যা প্রথম থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এক সূত্রে গ্রথিত। অধ্যায়গুলির সমাপতন বাঞ্ছনীয় না হলেও একটি অধ্যায় যেন তার পরেরটির সঙ্গো সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে যাতে দুটির মধ্যে কোনও ধরণের অসম্বন্ধতা লক্ষ্য না করা যায়।

ডকুমেন্টেশন : এই অংশ থাকে পাদটীকা, যার মূল উদ্দেশ্য হল কোনও বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা বা বৈধতা দেওয়া।

সংযোজন

এই অংশে যাকে কিছু প্রাসঙ্গিক সহায়ক উপাদান, যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও মূল পাঠ্যাংশের পক্ষে অপরিহার্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনও সমাজ-গবেষণা বা সমীক্ষায় এই অংশে থাকে প্রশ্নমালা, অসংশোধিত তথ্য ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী

গবেষক তাঁর কাজে যে সব উৎস বা উপাদানের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, শেষে থাকা এই অংশে সেগুলির উল্লেখ থাকে। এগুলির সংখ্যা বেশী হলে গ্রন্থপঞ্জীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিলে সুবিধা হয়। ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জীতে প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক উৎসগুলিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়।

রচনাশৈলী

ম্যাথু আর্নল্ড (১৮২২-১৮৮৮) বলেছিলেন, "যদি কিছু বলার থাকে তাহলে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তা বলুন। শৈলীর প্রকৃতরহস্য সেটাই।" বার্নার্ড শ বলেছিলেন, "প্রথমেই তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিন—সব রকমের শৈলীর ভিত্তি সেটাই।" আবার জোনাথান সুইফ্‌ট "যথাযথ স্থানে যথাযথ শব্দকে" উত্তম শৈলীর মানদণ্ড হিসাবে দেখেছিলেন। রিপোর্ট রচনা স্পষ্ট হলে তার উপস্থাপনা যুক্তিনির্ভর, সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

রচনা স্পষ্ট হবার এক প্রয়োজনীয় শর্ত হল সাধারণ, পরিচিত শব্দের ব্যবহার এবং সরল বাক্য গঠন। বিমূর্ত শব্দ এড়িয়ে নির্দিষ্ট অর্থবাহী শব্দ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয় এবং ঘুরিয়ে কথা না বলে ছোট ছোট শব্দের মাধ্যমে সোজাসুজি বক্তব্য পেশ করা কাম্য। অশিষ্ট বা ইতর শব্দের ব্যবহার কোনও অবস্থাতেই উচিত নয়। সাধারণত কর্তৃবাচ্যে বাক্য গঠন করা হলেও, ব্যক্তিগত সর্বনাম, যেমন আমি, আপনারা, আমরা ইত্যাদি এড়িয়ে চলার জন্য কর্মবাচ্যে বাক্য গঠন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "আমি দশটি ছাত্রের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম" লেখার স্থানে লেখা উচিত "দশটি ছাত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল।" সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা উচিত বলার অর্থ এই যে গবেষকের উচিত কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত শব্দ, অস্পষ্ট শব্দ, বিদেশী শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, আনকোরা নতুন শব্দ ইত্যাদি প্রয়োগ না করা।

গবেষকের উচিত কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সামঞ্জস্য, সম্বন্ধবাচক অব্যয়ের সঠিক প্রয়োগ এবং শব্দবিন্যাসের উপর সতর্ক নজর দেওয়া। এটা লক্ষ্য করা যায় যে সম্বন্ধবাচক অব্যয় প্রায়শই ভুল ভাবে প্রয়োগ করা হয়। শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, গুণবাচক শব্দ, বাক্যাংশগুলিকে তারা যে শব্দগুলির প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের যথাসম্ভব কাছাকাছি স্থাপন করা দরকার। ভুল শব্দবিন্যাস কোনও বাক্যকে অস্পষ্ট, এমনকী অর্থহীন করেও তুলতে পারে।

উৎস থেকে উদ্ধৃতি

রিপোর্ট লেখার সময় গবেষককে কখনও কখনও বিভিন্ন সূত্র বা দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিতে হয়। গবেষকের কোনও বক্তব্যকে সমর্থন করতে বা কোনও বক্তব্যকে আরও জোরালো করতে বা নিছক ঋণ স্বীকার করার

উদ্দেশ্যে এই উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োজন হয়। আবার কোনও গবেষক যদি কোনও আইন বা আঙ্গিক সূত্র বা ধারণাকে মূল লেখকের মত স্পষ্ট বা সাবলীল ভাষায় পূনর্লিখন করতে সক্ষম হন, সেক্ষেত্রে তিনি বিনা দ্বিধায় উদ্ধৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উদ্দেশ্য যাই হোক, উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত এবং তা যেন মূল পাঠ্যাংশের সঙ্গো ভালভাবে মিশে যায়।

উদ্ধৃতির পদ্ধতি : কোনও উদ্ধৃতির প্রথমে ও শেষে দুটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়। উদ্ধৃতির ভিতরে আরও একটি উদ্ধৃতি থাকলে তার প্রথমে ও শেষে একটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়। একক উদ্ধৃতি চিহ্নটি বাক্যের শেষে এসে পড়লে একটু জায়গা ছেড়ে দুটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়।

দীর্ঘ কোনও উদ্ধৃতিকে ছোট হরফে (মুদ্রিত পৃষ্ঠায়) বা এক লাইন জায়গা ছেড়ে (টাইপ করা পাণ্ডুলিপিতে) ছেড়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন দেবার প্রয়োজন হয় না।

উহ্যপদ (ellipses) : তাঁর বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক না হলে কোনও কোনও সময় গবেষক কোনও উদ্ধৃতি দেবার সময় কিছু কিছু শব্দ, শব্দগুচ্ছ এমনকী বাক্যও বাদ দিয়ে দেন। এই বাদ দেওয়াকে তিনটি বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। বাক্যের শেষে কিছু বাদ দেওয়া হলে চতুর্থ একটি বিন্দু ব্যবহার করা হয় যা পূর্ণচ্ছেদের কাজ করে। বোধগম্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কোনও শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যোগ করলে সেগুলিকে বর্গ-বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়।

উদ্ধৃত পুস্তক বা পত্রিকার নামের নীচে রেখা দেওয়া হয় এবং কোনও পুস্তকের অর্ন্তগত প্রবন্ধ ইত্যাদির নামের প্রথমে ও শেষে দুটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়।

বিশ্বস্ততা : প্রতিটি উদ্ধৃতি অবিকৃত হওয়া উচিত। এর অর্থ মূল রচনার প্রতিটি শব্দ, বানান, বিরামচিহ্নকে উদ্ধৃতিতে একই রকম ভাবে রাখা উচিত। অবশ্য প্রাচীন পাঠ্যাংশের আধুনিকীকরণের সময় কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে রিপোর্টের কোনও একস্থানে এই প্রসঙ্গো জানিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

লিপ্যন্তর (transliteration)

সংস্কৃত বা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার পাঠ্যাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিলে রোমান লিপিতে লিপ্যন্তর করে নেওয়া উচিত যার জন্য ধ্বনি নির্দেশক সংকেতচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। দেবনাগরী থেকে রোমানে লিপ্যন্তরের উদাহরণ :

y fU = C

a ka tha bha

ডকুমেন্টেশন

'ডকুমেন্টেশন' শব্দটি গ্রন্থাগারবিজ্ঞান, তথ্যবিজ্ঞান এবং গবেষণাতেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওয়েবস্টারের 'থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি' উদ্ধৃত করলে গবেষণার ক্ষেত্রে এর অর্থ "কোনও রচনার মধ্যে তথ্য বা তত্ত্বের সমর্থনে প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসাবে পাদটীকা সংযোজনের সংস্থান।"

পাদটীকা : পাদটীকা দুই ধরণের হয়। এদের মধ্যে একটি হল বিষয় বা ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা যা আরও তথ্যের সাহায্যে কোনও বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে। এই ধরণের পাদটীকা আবার প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে রিপোর্টের মূল পাঠ্যাংশে উল্লিখিত কোনও ব্যক্তি, স্থান বা বস্তুকে চিহ্নিত করে। এর ফলে তা এক পাঠ করার বিষয় হয়ে ওঠে। এই ধরণের পাদটীকার প্রয়োজন আছে কারণ মূল পাঠ্যাংশে কোনও বক্তব্য বা ঘটনার বিশদীকরণ করলে তা অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ মনে হতে পারে বা আখ্যানের সুত্রটি ছিন্ন করতে পারে যা পাঠকের মনোযোগ বিচ্যুত করতে পারে।

অন্য ধরণের পাদটীকাটি হল তথ্যমূলক বা রেফারেন্স পাদটীকা।

এই ধরণের পাদটীকাতে রিপোর্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত কোনও বক্তব্য বা উদ্ধৃতির সূত্র বা প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রথম ধরণের পাদটীকাটি অপরিহার্য নয়। এটিকে বাদ দিয়েও গবেষণা রিপোর্ট লেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের পাদটীকাটিকে বাদ দেওয়া সহজ নয়। নাম থেকেই এটা বোঝা যায় যে পাদটীকা থাকে পৃষ্ঠার পাদদেশে। এতে পাঠকের সুবিধা হলেও টাইপ করা বা ছাপার সময় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণে এখন বিকল্প হিসাবে 'এন্ড-নোটের' ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এন্ড-নোট বলতে এক ধরণের পাদটীকাকেই বোঝায়, যা একসঙ্গে পৃথক একটি পৃষ্ঠায় প্রতিটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের নীচে দেওয়া হয়। কোনও ব্যাখ্যামূলক টীকা না থাকলে এর শীর্ষনাম হিসাবে "টীকা ও রেফারেন্স" বা শুধুমাত্র "রেফারেন্স" ব্যবহার করা হয়।

তথ্যমূলক পাদটীকার উদ্দেশ্য

তথ্যমূলক পাদটীকার উদ্দেশ্য হল তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এটা দেখানো যে, রিপোর্টের রচয়িতা বৌদ্ধিক ভাবে সৎ এবং সেই কারণে যে সব সূত্র বা উৎস থেকে তিনি তথ্য বা ভাবনা আহরণ করেছেন তাদের প্রতি ঋণ স্বীকার করা। এর আরও একটি উদ্দেশ্য হল বিস্তারিত বিবরণ বা ব্যবহৃত উপাদানগুলির প্রামাণিকতার জন্য যে সূত্রগুলি দেখা প্রয়োজন সেগুলিকে নির্দেশ করা। এছাড়া, এই পদটীকা গবেষণার বিষয়টির এক বৃহত্তর পটভূমি পাঠকের কাছে তুলে ধরার কাজ করে।

তথ্যমূলক পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জী

তথ্যমূলক পাদটীকা শুধু সেই নথি বা দলিলগুলির উল্লেখ করে যেগুলি থেকে রিপোর্টে ব্যবহার করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জী এগুলি ছাড়াও আরও কিছু প্রাসঙ্গিক নথির উল্লেখ করে, গবেষক যেগুলির

পরামর্শ নিয়েছেন অথচ রিপোর্টে সেগুলি থেকে কোনও অংশ তুলে দেননি। এছাড়া, গ্রন্থপঞ্জীর উদ্দেশ্য হল লেখক, শীর্ষনাম, সংস্করণ ও মুদ্রণের মাধ্যমে কোনও নথিকে চিহ্নিত করা। নীচের উদাহরণটি ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দুইয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে।

তথ্যমূলক পাদটীকা : Joseph Hone, *W.B. Yeats : 1865-1938*
(London : Macmillan, 1965), p. 108

গ্রন্থপঞ্জী : Hone, Joseph. *W. B. Yeats : 1865-1938.*
London : Macmillan, 1965.

উদ্ধৃতির (Citation) শৈলী

তথ্যমূলক পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জী, দুটিই কোনও প্রামাণ্য শৈলীতে প্রস্তুত করা দরকার। উদ্ধৃতির বিভিন্ন শৈলী আছে যাদের মধ্যে এগুলির নাম করা যেতে পারে : ১) IS : 2381-1963 Recommendations for Bibliographical Reference, ২) Anglo-American Cataloguing Rules, ৩) The Chicago Manual of Style ৪) MLA Handbook for Writers of Research Papers.

এদের মধ্যে যে কোনও একটি শৈলীকে অনুসরণ করা যেতে পারে, কিন্তু যেটিকেই করা হোক, সেটিকে সমগ্র রিপোর্ট জুড়ে টানা মেলে চলতে হবে। শৈলীতে কোনও পরিবর্তন ঘটালে সেই পরিবর্তনকেও টানা অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যা কাম্য তা হল সংগতি। এই আলোচনাতে আমরা MLA শৈলী ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগে তথ্যমূলক পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জীর প্রভেদ বোঝানোর সময়েও এটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্যমূলক পাদটীকার উদ্ধৃতি

পাদটীকাকে যাতে টানা একটি বাক্যের মত পড়া যায়, সেই কারণে অভ্যন্তরীণ পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন ব্যবহার না করে প্রকাশনার স্থান, প্রকাশক এবং প্রকাশনের সময়কে বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করা হয়।

পাদটীকার সংখ্যা : পাদটীকার সংখ্যা হল পাঠ্যাংশের কোনও লাইন বা পাদটীকার উদ্ধৃতির উপরে সব বিরামচিহ্নের শেষে দেওয়া সংখ্যা। নামের নীচে রেখা দেওয়া : গবেষণা রিপোর্টে থাকা যে কোনও গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম ও উপনামের নীচে রেখা দেওয়া উচিত, অর্থাৎ সেগুলিকে 'আন্ডারলাইন' করা উচিত।

নিবন্ধের উদ্ধৃতি

কোনও পত্রিকার নিবন্ধের উদ্ধৃতিতে থাকা উচিত, ১) লেখকের নাম, ২) নিবন্ধের শীর্ষনাম (দুটি করে উদ্ধৃতি চিহ্নের মাঝখানে), ৩) 'আন্ডারলাইন' করে পত্রিকার নাম ও ৪) অন্যান্য নির্দিষ্ট তথ্য ও পৃষ্ঠার নম্বর।

৪.৫ উপসংহার

গবেষণা রিপোর্ট লেখার জন্য যথেষ্ট পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি আবশ্যক। এছাড়া, ধারাবাহিক চিন্তা এবং সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত রচনাই গবেষণা রিপোর্টকে ত্রুটিহীন করে তুলতে পারে। রিপোর্ট রচনার জন্য প্রয়োজন হয় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা, প্রয়াস, ধৈর্য, বিষয়টি সম্পর্কে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্য ও তার বিশ্লেষণ এবং ভাষার উপর যথেষ্ট দখল ও নিরপেক্ষতা। সাধারণ মানুষের জন্য রিপোর্ট রচনা করলে সেটি সরল, আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত। আবার বিশেষ কোনও গোষ্ঠী, যেমন প্রশাসক শ্রেণীর জন্য রচিত রিপোর্টের চরিত্র ততটা সাধারণ বা অত্যন্ত প্রকরণগতও হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

রিপোর্ট রচনার সময় গবেষকের উচিত সর্বদা তাঁর নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। উত্তরদাতার পরিচয় গোপন রাখার আশ্বাস দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কোনও তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করলে গবেষকের উচিত সেই গোপনীয়তাকে রক্ষা করা। এছাড়া গবেষকের লক্ষ্য রাখা উচিত সেই গোপনীয়তাকে রক্ষা করা। এছাড়া গবেষকের লক্ষ্য রাখা উচিত যে রিপোর্টে প্রদত্ত সব তথ্যই যেন ত্রুটিহীন, পক্ষপাতশূন্য ও অবিকৃত হয়। কোনও গবেষণা রিপোর্টের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এর বিষয়বস্তুকে সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কাজেই রচনা স্বচ্ছ বা প্রাঞ্জল না হলে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজ নয়। রিপোর্ট রচনার সময়ে একথা মনে রেখে গবেষকের অগ্রসর হওয়া উচিত।

৫.০ গবেষণা-প্রস্তাব সূত্রবন্ধ করার জন্য ICSSR নির্দেশিকা

কোনও গবেষণা-প্রস্তাব আসলে এক ধরণের বিশদ পরিকল্পনা। ICSSR-কে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা করা ছাড়াও যে কোনও সুচিন্তিত গবেষণা প্রস্তাব পরবর্তীকালে তার রূপায়ণেও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। সুতরাং কোনও যথাযথ গবেষণা-প্রস্তাব সূত্রায়িত করার প্রতিটি প্রচেষ্টাই সুফল দিতে পারে।

সাহিত্য এবং সমাজবিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ, পদ্ধতিগত কৌশল, তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয় জড়িয়ে থাকে। কাজেই এই স্বল্প পরিসরে কোনও গবেষণা প্রস্তাবের সব দিকগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি সব ধরণের গবেষণা প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১) গবেষণার জন্য কোনও সমস্যা বা বিষয়কে সূত্রবন্ধ করা ;

২) প্রস্তাবিত গবেষণার সীমা নির্দ্ধারণ করা এবং স্বয়ংস্বতন্ত্র অংশগুলির বিশদীকরণ করা ;

৩) তথ্য সংগ্রহের সূত্র ও পদ্ধতি ; এবং

৪) তথ্য বিশ্লেষণ।

কোনও গবেষণাযোগ্য সমস্যা নির্বাচন নির্ভর করে গবেষকের ঝোঁক, প্রশিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর। সমস্যাটি যাই হোক না কেন—অবশ্য সেটি গবেষণাযোগ্য হতেই হবে—কোনও নির্দিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় নিয়ে

প্রায়শই চিন্তা করতে হয় : সামাজিক বাস্তবকে জানা এবং/ অথবা তার নির্দিষ্ট দিক বা দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করা। এই দুটির মধ্যে কোনটি কাউকে উদ্দীপিত করছে, তা গবেষণা প্রস্তাবটির বিকাশ ও নকশার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। প্রথম লক্ষ্যটির জন্য প্রয়োজন হয় গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মনে করা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিচারে সামাজিক বাস্তবের একটি অংশবিশেষ সম্বন্ধে ছক করা। অন্য দিকে লক্ষ্য যদি হয় বিশেষ কোনও সামাজিক ঘটনা ঘটনার ব্যাখ্যা করা, তাহলে জোর দেওয়া হয় ওই বিশেষ ঘটনাটি কেন ঘটে এবং কারণগত অথবা অনুষঙ্গাবাদী নিরিখে কী কী বিষয়ের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করা যায় তার উপর। কাজেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই দুই ধরণের গবেষণার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কৌশলের প্রয়োজন হয়।

গবেষণার লক্ষ্য যাই হোক না কেন, এটা বোঝা যায় যে সামাজিক বাস্তবের কোনও নির্দিষ্ট দিক নিয়ে ছক করা অথবা কোনও ঘটনা ঘটার ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে জরুরী বৈশিষ্ট্যগুলি নির্বাচনের জন্য সমস্যা ও তার বিভিন্ন দিকগুলিকে এক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা আবশ্যক। এই পরিপ্রেক্ষিত যোগাতে পারে এক দিকে সমাজ বিজ্ঞানের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে সমস্যা সম্পর্কে নেওয়া তাত্ত্বিক অবস্থান। কাজেই কোনও যথার্থ গবেষণার নকশা তৈরির শুরুতে এক গবেষণাযোগ্য সমস্যাকে সূত্রবন্ধ করা এবং পরে একে কোনও তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করে সেই বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং অনুসন্ধানের বিষয়টি সম্পর্কে প্রকাশনাগুলির সঙ্গো সাধারণভাবে পরিচিত হওয়া গবেষণার নকশা তৈরির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এর উদ্দেশ্য সবকটি প্রকাশিত রচনার কে তালিকা প্রস্তুত করা নয়। এর লক্ষ্য হল প্রস্তাবিত গবেষণার পক্ষে উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিষয়গুলিকে বেছে নেওয়া। এই বেছে নেওয়া একদিকে যেমন সমস্যাটির বিশিষ্টতা নির্ণয় করে, তেমন অন্য দিকে গবেষণার বিষয়টির তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতকে আলোকিত করে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতের স্পষ্ট রেখাগুলি এবং প্রকাশিত রচনাগুলি পর্যালোচনার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক আছে। হাতে নেওয়া সমস্যাটি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নির্বাচিত রচনাগুলি প্রাসঙ্গিক বা যথেষ্ট হবে কী না, সেই বিষয়ে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত সহায়তা করতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে আসবে, সেটি ব্যক্তিগত নির্বাচনের ব্যাপার।

বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক, গবেষণা যে ধরণেরই হোক না কেন, অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত সমস্যাটি অনিবার্যভাবে এক জটিল ও বহুমুখী সামাজিক বাস্তবের মধ্যে নিহিত থাকে। এই কারণে সেই বিশেষ সমস্যাটির পক্ষে প্রাসঙ্গিক সামাজিক বাস্তবের দিকগুলি ইঙ্গিত করার প্রয়োজন হয়। যে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতটি গ্রহণ করা হয়েছে সেটিই কোন কোন দিক নির্বাচন করা হবে তা নির্ণয় করে। এ গবেষণার সীমাও নির্ধারণ করে এবং অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকৃতি সুনিশ্চিত করার ভিত্তি প্রদান করে।

গবেষণা উদ্যমের দিকগুলি নির্ণয় করা সচরাচর সামাজিক বাস্তবের নির্দিষ্ট চিন্তার ক্ষেত্রের সঙ্গো সম্পর্কিত ধারণাগুলির ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এখানে যেহেতু একটি ধারণা বা চিন্তার ক্ষেত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গো পরীক্ষালব্ধ সত্যের সংযুক্তি ঘটায়, সেহেতু কোনও গবেষণা প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে এমন ধারণা বা চিন্তার ক্ষেত্রগুলির স্পষ্ট ও নিখুঁত সংজ্ঞা নিরূপণ করা জরুরী। এছাড়া, ভাবনা ও চিন্তার ক্ষেত্রগুলি ক্রিয়াশীল করা প্রয়োজন যাতে ভাবনাগুলি ও তাদের পরীক্ষালব্ধ নিদর্শনগুলির মধ্যেকার পথ সহজ ও বৈজ্ঞানিক বিচারে

স্বীকার্য হয়।

বর্ণনামূলক গবেষণার নকশার ক্ষেত্রে দিকগুলি বর্ণনা ও তাদের ক্রিয়াশীল করার বেশী কিছু প্রয়োজন না হলেও ব্যাখ্যামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে আরও অতিরিক্ত তথ্যের দরকার হয়, যেমন ব্যাখ্যামূলক কাজটি কীভাবে সম্পাদন করা হবে। একে প্রথমেই সেই বিষয়গুলির দিকে ইঙ্গিত করতে হবে যাদের সাহায্যে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হবে এবং দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির মধ্যে প্রকাশিত সম্পর্কগুলির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। অন্যভাবে প্রকাশ করলে, প্রস্তাবে এমন এক ব্যাখ্যামূলক মডেল থাকবে যাতে কোনও না কোনও ধরণের আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

গবেষণার নকশা তৈরির পরবর্তী পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কী ধরণের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করা, কী পদ্ধতিতে এই সংগ্রহের কাজ করা হবে তা নির্ণয় করা এবং একক হিসাবে কী ধরা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সমস্যার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলি থেকে একেবারে তৈরি (ready made) তথ্য পাওয়া যেতে পারে অথবা তথ্য সৃষ্টি করতে হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎসের উল্লেখ করা আবশ্যক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু উপকরণ, যেমন প্রশ্নমালা ইত্যাদি গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ বা সংবাদদাতাকে কাজে লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। সে যাই হোক, কী প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ করা আবশ্যক। এছাড়া ব্যক্তি, সমষ্টি বা অন্য কিছু—যাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সেই 'এককটির' উল্লেখ থাকা উচিত।

অনেক সময় কাম্য হলেও কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার সবকটি দিক বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। সময় ও সংগতির সীমাবদ্ধতা কয়েকটি মাত্র দিক বেছে নিতে বাধ্য করে যাদের সমগ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি মনে করা হয়। এই কারণে কোনও কোনও ধরণের গবেষণার নকশায় নমুনা নির্বাচন বা স্যাম্পলিঙ পদ্ধতি ও স্যাম্পলের আয়তন বা বহর ও সেগুলি নির্বাচনের কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেখানে অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু মাত্র একটি 'ইউনিট', সেখানে ওই বিশেষ ইউনিট-টিকেই যে কেন বেছে নেওয়া হল প্রস্তাবে তার উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে গেলে তাকে এমনভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে যাতে কোনও বিশ্লেষণের পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ সহজ হয়ে ওঠে। একথা মনে রাখা উচিত যে উদ্দেশ্য পূর্ণ হলেই সেই উদ্দেশ্যের জন্য সংগৃহীত তথ্যের মূল্য ফুরিয়ে যায় না। আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য অন্য গবেষকরা তা ব্যবহার করতে পারেন। সঠিকভাবে বলতে গেলে তথ্য নথিবদ্ধ করার সময় তার পুনর্ব্যবহারের সংস্থান রাখা উচিত। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য পরিমাণগত তথ্যের ক্ষেত্রে, যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে নথিবদ্ধ তথ্যকে সহজেই পুনর্বিশ্লেষণের কাজে লাগানো যায়। প্রস্তাবে এরও সংস্থান থাকা উচিত এবং তথ্য কীভাবে বিশ্লেষণ করা হবে সেই সম্পর্কে উল্লেখ থাকা উচিত। বিশেষত ব্যাখ্যামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে কোডিঙের নকশা, বিভিন্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ ইত্যাদি সমেত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা গবেষণার নকশার অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, কোনও যথার্থ গবেষণার নকশা গঠন নীচের নির্দেশিকা অনুসারে করা বাঞ্ছনীয় :

I. প্রকল্পের শীর্ষনাম

II. সমস্যার পরিচয়

গবেষণা প্রস্তাবের প্রথম পরিচ্ছেদেই যে সমস্যাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হচ্ছে তার স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি এবং আলোচিত বিষয়টির তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে সমস্যাটির অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে হবে। বিষয় বা সমস্যাটির গুরুত্ব, এই প্রস্তাবিত গবেষণা তত্ত্ব, পদ্ধতিবিদ্যা, এরং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কতখানি অবদান রাখতে পারবে এবং এই অনুসন্ধানের জাতীয় তাৎপর্যকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

III. প্রকাশিত রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিতি

এই ক্ষেত্রে গবেষণার বর্তমান অবস্থান (গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা ফলাফলগুলি অর্ন্তভুক্ত করে) সংক্ষেপে বর্ণনা করে গবেষণা প্রস্তাবটিকে ফলাফলগুলির প্রাসঙ্গিকতা বা অসম্পূর্ণতা অথবা হাতে নেওয়া গবেষণার দৃষ্টিকোণকে স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে।

IV. ধারণাগত কাঠামো

সমস্যা এবং সেটি সম্পর্কে অনুসন্ধানের তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত করার পর গবেষণা প্রস্তাবের উচিত কী কী ধারণার ব্যবহার করা হচ্ছে এবং গবেষণার পক্ষে সেগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ করা। এছাড়াও সমস্যাটি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষালব্ধ বাস্তবের কোন কোন দিকগুলি পরীক্ষা করা উচিত সেটিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

V. গবেষণার প্রশ্ন বা প্রকল্প

ধারণাগত কাঠামো ও দিকগুলি নির্দিষ্ট করা হয়ে গেলে এই গবেষণা নির্দিষ্ট যে সব প্রশ্নের উত্তর চায় সেগুলিকে স্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করা উচিত। ব্যাখ্যামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলিকে নির্দিষ্ট করা এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি জানান দেওয়া গবেষণা প্রস্তাবের এক আবশ্যক অংশ।

VI. গবেষণার বিস্তার (Coverage)

উত্থিত প্রশ্ন বা পরীক্ষার জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নমুনা বা স্যাম্পলিঙের প্রয়োজন হলে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানানো উচিত :

১) গবেষণার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র

২) স্যাম্পলিঙ ফ্রেম

৩) স্যাম্পলিঙ পদ্ধতি

৪) পর্যবেক্ষণ এবং স্যাম্পলিঙের আয়তন বা পরিমাণের ইউনিট

গবেষণার জন্য কোনও 'কন্ট্রোল গ্রুপ' বা নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর প্রয়োজন হলে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত। নমুনার আয়তন ও প্রকৃতি বা চরিত্র নির্ধারণের ব্যাখ্যা দেওয়াও প্রয়োজন। যে প্রস্তাবগুলিতে নমুনা নির্বাচনের প্রয়োজন নেই, সেগুলির ক্ষেত্রে উচিত যথাযথভাবে তাদের কৌশল এবং যৌক্তিকতার বিবরণ দেওয়া।

VII. তথ্য সংগ্রহ

কী কী ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন তার নির্দিষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত। বিভিন্ন ধরণের তথ্যের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন উৎস এবং সেগুলি সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও কৌশলেরও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নমালা বা 'সিডিউল' ব্যবহার করা হলে এগুলি সূচিত করা উচিত :

১) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রশ্নমালা বা 'সিডিউল' বন্টন, যেমন চিহ্নিত করণের তথ্য, আর্থ-সামাজিক তথ্য ইত্যাদি ;

২) জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের আনুমানিক সংখ্যা ;

৩) কোনও মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে কী না ;

৪) প্রশ্নমালা বা 'সিডিউলের' মধ্যে কোনও প্রক্ষেপণমূলক পরীক্ষা অর্ন্তভুক্ত আছে কী না ;

৫) এক একটি সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় আনুমানিক সময় ;

৬) নির্ঘন্ট প্রস্তুত করার পরিকল্পনা আছে কী না ;

৭) কোডিঙের পরিকল্পনা।

সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলি জানানো জরুরী :

১) কীভাবে সাক্ষাৎকারগুলি গ্রহণ করা হবে ;

২) সাক্ষাৎকারগুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করলে এগুলি বর্ণনা করতে হবে :

১) পর্যবেক্ষণের ধরণ ;

২) পর্যবেক্ষণের ইউনিট ;

৩) শুধু এই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হবে অথবা অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহৃত হবে।

VIII. তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

কীভাবে বিভিন্ন ধরণের তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হবে, সারনিবন্ধকরণের পরিকল্পনা, কমপিউটারের মাধ্যমে কী কী ধরণের তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হবে—এই সব বিষয়গুলিকেই বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

IX. টাইম বাজেটিঙ (Time budgeting)

কাজটিকে সুবিধাজনক কয়েকটি পর্যায়ে ভেঙে নেওয়া উচিত এবং প্রতিটি পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করতে কতটা সময় লাগছে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

যেমন, এই পর্যায়গুলির অর্ন্তভুক্ত হতে পারে :

১) প্রস্তুতিমূলক কাজ, যার মধ্যে পড়ে কর্মীদের নির্বাচন এবং নিযুক্তি ও তাদের প্রশিক্ষণ ;
২) পরীক্ষামূলক গবেষণা (pilot study), যদি প্রয়োজন হয় ;
৩) নমুনা নির্বাচন ;
৪) উপকরণের প্রস্তুতি ;
৫) তথ্য সংগ্রহ ;
৬) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (এর মধ্যে পড়ে কোডিঙ, সম্পাদনা, কমপিউটার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি) ;
৭) তথ্য বিশ্লেষণ ;
৮) রিপোর্ট রচনা।

X. সাংগঠনিক কাঠামো

পদ, দায়িত্ব, কর্মীর সংখ্যা, তাদের যোগ্যতার স্তর ইত্যাদি সূচিত করে একটি সাংগঠনিক তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

XI.

মোট সময় বা শ্রম-মাস (man-month) ও কী কী ব্যবস্থা প্রয়োজন, এই দুইয়ের দিক থেকে প্রকল্পের ব্যয় অনুমান করতে হবে। এই শিরোনামগুলির অধীনে হিসাব করতে হবে :

পদ-কর্মীর সংখ্যা-বেতন (ভাতা ইত্যাদি সমেত)-স্থায়ীত্ব প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ

১) কর্মীবৃন্দ
২) ভ্রমণ
৩) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ
৪) সরঞ্জাম ও মুদ্রা
৫) উপকরণ (এই খাতে মোট ব্যয় মোট বাজেটের পাঁচ শতাংশের বেশী হওয়া উচিত নয়)

৬) গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি (ব্যয় মোট খরচের পাঁচ শতাংশের বেশী হবে না)

৭) ডাক সমেত নৈমিত্তিক ব্যয়

৮) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন)

৯) স্থির (overhead) ব্যয় (মোট ব্যয়ের পাঁচ শতাংশ)

১০) সর্বমোট ব্যয়।

গবেষণা প্রস্তাবের আনুমানিক বাজেট পেশ করার সময় প্রকল্প পরিচালকের টাইম বাজেট এবং গবেষণা প্রস্তাবের বিভিন্ন স্তরগুলি বিবেচনা করা উচিত। আনুমানিক বাজেটের বিভিন্ন উপাদানগুলির জন্য সময় এবং অর্থ বরাদ্দ করার যুক্তিগত ভিত্তিগুলি উল্লেখ করা একান্তই আবশ্যক।।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

৫.১ সাহিত্য-গবেষণার বিষয়-প্রস্তাবের সংক্ষিপ্তসার রচনার নির্দেশিকাপত্র

নিবন্ধন-প্রার্থীর নাম ❐
সম্পূর্ণ ঠিকানা ❐
দূরভাষ সংখ্যা ❐

১. গবেষণার বিষয়-প্রস্তাবের উপজীব্য এলাকা ❐

২. গবেষণার বিষয়-শিরোনাম ❐

৩. বিষয়-শিরোনামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ❐

৪. গবেষণার সম্ভাব্য মূল প্রতিপাদ্য কী ? ❐

৫. গবেষণার সম্ভাব্য গৌণ প্রতিপাদ্য কী কী ? ❐

৬. সম্ভাব্য মূল প্রতিপাদ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাষা/ সাহিত্য/ সংস্কৃতির কোন্ নূতন/অনালোচিত/স্বল্পালোচিত দিক বিশেষভাবে উন্মোচিত বা সমৃদ্ধ হবে ? ❐

৭. সম্ভাব্য গৌণ প্রতিপাদ্যগুলির গুরুত্ব কী ? ❐

৮. প্রস্তাবিত গবেষণাকে অভিসন্দর্ভ রূপে প্রস্তুত করবার সময়ে প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য অধ্যায়গুলির উপজীব্য কী-কী, (সম্ভব হলে) শিরোনামসহ নির্দেশ করুন ❐ (এই অংশটি ১৫০০-২০০০ শব্দের মধ্যে লেখা বাঞ্ছনীয়) ❐

৯. প্রস্তাবিত গবেষণার সঙ্গো প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কোনও কিছু আলোচনা পড়ে থাকলে, সেগুলির উৎস সহ (বইয়ের/ লেখার নাম ❐ লেখকের নাম ❐ প্রকাশের স্থান ও সময়/ পত্রিকার নাম, সংখ্যা ও তারিখ দিতে হবে) উল্লেখ করুন এবং পূর্বতন ঐ আলোচনাগুলির উপর কী-কী সংযোজন/ সংশোধন/ পরিমার্জন হতে পারে সংক্ষেপে লিখুন।❐

১০. গবেষণা নির্বাহের জন্য আপনি কী-কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন লিখুন (যথা : গ্রন্থ/ নিবন্ধ পাঠ এবং/ অথবা ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং/ অথবা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলির গুরুত্ব ও যাথার্থ্য যাচাইয়ের পর (ক) সুনির্দিষ্ট কিছু তত্ত্ব অন্বেষণ করার প্রয়াস পাওয়া ; (খ) আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তথ্যগুলির বিচার করে সিদ্ধান্ত করা ; (গ) তুলনামূলকভাবে তথ্য বিচার করা ; (ঘ) তথ্যগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক মাপকাঠিতে বিচার করা ; (ঙ) তথ্যগুলির আঙ্গিকবাদী পদ্ধতিতে রস/ সৌন্দর্য/ অন্তর্নিহিত দার্শনিকতার মূল্যায়ন করা ; (চ) তথ্যগুলির সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্যান্য বিদ্যাশৃঙ্খলার সঙ্গো এই গবেষণার (সম্ভাব্য) সম্পর্ক নির্ণয় করা ; (ছ) অন্য কোনও পদ্ধতি (এই ক্ষেত্রে আপনাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলতে হবে)। উত্তর দেবার সময়ে শুধু 'ক'/ 'খ' ইত্যাদি মর্মে উল্লেখ করুন (জ ব্যতীত)।

১১. প্রাথমিকভাবে প্রাসঙ্গিক একটি বিস্তৃত গ্রন্থ/ নিবন্ধ-পঞ্জি প্রস্তুত করুন (যেগুলি পড়েছেন এবং যেগুলি পড়বেন বলে ঠিক করছেন পৃথক ভাবে উল্লেখ করবেন)। তালিকাটি এইভাবে সাজাবেন :

(বাংলা লেখাগুলির তালিকা প্রথমে, ইংরেজি/অন্যভাষার লেখাগুলি তার পরে উল্লেখিত হবে)

ক. লেখকের পদবি (বর্ণানুক্রমিকভাবে), লেখকের ব্যক্তিনাম ❐ গ্রন্থনাম ❐ প্রকাশকের নাম ❐ প্রকাশের স্থান ❐ সংস্করণ ❐ প্রকাশের বছর) ;

খ. লেখকের পদবি ও নাম (পূর্ববৎ বিন্যাসে) ❐ নিবন্ধের নাম ❐ পত্রিকার নাম ❐ প্রকাশের স্থান ❐ প্রকাশের মাস, বছর এবং সংখ্যা ;

গ. লেখকের পদবি ও নাম (পূর্ববৎ বিন্যাসে) ❐ নিবন্ধের নাম ❐ ওয়েবসাইট পরিচিতি ❐ তারিখ॥

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

৬.০ অনুশীলনী

১. সংক্ষেপে বর্ণনা করুন :

(ক) প্রশ্নমালা, (খ) তথ্যসারণি (গ) সাক্ষাৎকার সহায়িকা, (ঘ) সংখ্যাতাত্ত্বিক উপস্থাপনা (ঙ) সম্পাদনা (চ) মুখবন্ধ ও স্বীকৃতি (ছ) বিষয়সূচী (জ) তথ্যমূলক পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জী (ঝ) কাউ ইন্‌ভেক্‌সিং (ঞ) তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি।

২. গবেষণা-পদ্ধতিতে প্রশ্নমানের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব কতটুকু? প্রশ্নমালার গঠন, বিষয়, সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৩. রিপোর্ট কি করে লিখতে হয় তার বর্ণনা দিন।

৪. বিবলিওগ্রাফি বা গ্রন্থপঞ্জী কাকে বলে? এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৫. গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করুন।

৬. গবেষণা-প্রকল্পের প্রস্তাব কি ভাবে লিখতে হয়, দেখান।

৭.০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Young, Pauline V ❐ Scientific Social Survey and Research, 3rd ed, N.Y. Prentice Hall, 1960.
2. Goode, W. and Hatt ❐ Methods of Social Research, New York : McGraw-Hill, 1952.
3. ICSSR ❐ Asian Conference on Teaching and Research in Social Sciences. May 21-26, 1973 at Simla, New Delhi ; Association of Asian Social Science Research Council, 1973
4. ICSSR ❐ A Report on Social Sciences in India : Retrospective and Prospective, New Delhi, ICSSR Review Committee 1973.
5. Ghosh, B.N. ❐ Scientific Methods and Social Research, New Delhi : Sterling, 1982.
6. Dasgupta, S.K. ❐ Methodology of Economic Research, Bombay, Asia, 1968.
7. Agnihotri, Vidyadhar ❐ Techniques of Social Research, New Delhi, M.N. Publishers, 1980.
8. Bajpai S.R. ❐ Methods of Social Survey Research, Kanpur, Kitab Ghar, 1966.
9. Basu, M.N. ❐ Field Methods in Anthropology and other Social Sciences. Calcutta, Bookland, 1961
10. Mukherjee, P.K. ❐ Economic Surveys in Underdeveloped Countries, A Study in Methodology, Bombay, Asia, 1959.
11. Raj, Des ❐ Sampling Theory, Bombay McGraw-Hill, 1968
12. Ramachandran. P. ❐ Training in Research Methodology in Social Science in India. New Delhi, ICSSR, 1971

PGB : 08

পর্যায় - (2)

একক ১ ❐ অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা, বিকাশধারা এবং প্রকরণ প্রণালী

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা

১.৩ সারাংশ

১.৪ অনুশীলনী

১.৫ অনুবাদচর্চার বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী

১.৬ সারাংশ

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ উত্তরমালা

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি মূল দুটি ভাগে বিভক্ত। এককটির প্রথম অংশে ১৮ শতাব্দীর জার্মান মনীষী ইয়োহান গটফ্রিড হার্ডারের বিশ্বসংস্কৃতির ধারণার কথা বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি জার্মানিরই মহাকবি ভলঅফগ্যাঙ গ্যেটে কেন পারস্পরিক ভাবে সাহিত্যের সৃজন-সম্ভার বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য, অনুবাদই সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা, একথা উল্লেখ করে—কেন যুগে যুগে অনুবাদচর্চার প্রয়োজন ঘটেছে, সেকথাও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখিত। সংস্কৃতভাষায় লেখা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ কেন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি, অনুবাদের বিভিন্ন প্রকার-প্রকরণ নিয়েও এখানে বিস্তৃতভাবে তথ্যবিচার ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

আপনি যদি এই এককটি ভালো করে পড়েন, তাহলে আপনি অনুবাদচর্চার কারণ এবং বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আলোচনা করতে পারবেন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে কোনো অসুবিধাই হবে না। ভালো করে এককটি পাঠ করে অনুশীলনী দুটির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

১.২ অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা

বিখ্যাত জার্মান কবি-দার্শনিক গেটের এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু হার্ডারই সর্বপ্রথম 'বিশ্বসংস্কৃতি' নামে এক ধারণার কথা বলেন। একটি বিশেষ দেশের সংস্কৃতি যদি রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা অন্য কোনো কারণে অন্যদেশে ছড়াতে না পারে, বা অন্যদেশের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য গুণগুলিকে আত্মগত করতে না পারে, তাহলে সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সেই সংস্কৃতির প্রাণশক্তি অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গো যদি বিনিময় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে তার সমৃদ্ধি এবং বিকাশ রুদ্ধ হতে বাধ্য। এই বিনিময়ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া হবে। কিন্তু সঙ্গো-সঙ্গোই টেও মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক দেশেরই আলাদাভাবে জাতীয় সংস্কৃতি বলে একটা বিশেষ চরিত্র আছে। সেই পৃথক চরিত্রকে মেনে নিয়েই সেইসব আলাদা আলাদা সংস্কৃতির মিলগুলিকে খুঁজে নিয়ে কাছাকাছি আনতে হবে এবং তাদের ভিতরকার গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায়, পারস্পরিকভাবে বিনিময় করতে হবে। কাজেই একটি বিশেষ ভাষার লেখকের কাজ হবে তাঁর নিজের ভাষার ভাবনাচিন্তা এবং প্রকাশভঙ্গির যেসব বৈশিষ্ট্য তাঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকে অন্যদেশের লেখক ও পাঠকদের সামনে মেলে ধরা. যদি কোনো ভাষা সাহিত্যিক ঐতিহ্যে, সৃষ্টিকর্মে, দক্ষতায় অন্যদেশের তুলনায় কম সমৃদ্ধ হয় তাহলে সেই দেশের সাহিত্য অন্যান্য সব সমৃদ্ধ দেশের সাহিত্যের লেখক একটি ব্যাপক প্রেক্ষাপটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিজেদের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং সেই বিনিময়ের সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হতে পারি। ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবোধ জাগরূক করার জন্য ও ব্যাপক ও সুষ্ঠু অনুবাদকর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও যে আছে, সে কথাও এখানে একান্তভাবেই স্মরণযোগ্য।

তবে একটি কোনো সাহিত্যের এলাকাভুক্ত লেখকের পক্ষে বহুদেশের সাহিত্য আয়ত্ত করা কখনোই সম্ভব নয়। কেননা বহুদেশের সাহিত্য আয়ত্ত করতে গেলে বহুভাষাবিদ্ হতে হবে। সাধারণভাবে, প্রত্যেকটি সাহিত্য পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়েই দু-চারজনই থাকেন যাঁরা একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। সেইজন্যই গ্যেটে পারস্পরিক ভাবনার বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাহিত্যের অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি এটা ভালোভাবেই জানতেন যে, যে-কোনো সাহিত্যেই 'ভালো' অনুবাদ দুর্লভ। (এখানে প্রচলিত একটি ইতালীয় প্রবচন স্মরণীয় "অনুবাদ যদি সুন্দরী হয়, তাহলে তাকে অবিশ্বস্তা হতেই হবে এবং বিশ্বাসভাজন হলে, কুদর্শনা হতেই হবে তাকে !") কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনুবাদ আমাদের করতে হবে এবং অনুবাদের মাধ্যমে যে-সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। কেননা, প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তার প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের মধ্যেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গির সক্রিয়তা থাকে, সেগুলিকে অন্যদেশের ভাষায় অনুবাদ করা খুবই সমস্যার ব্যাপার।

কিছু আগেই বলেছি যে, দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের যে কয়েকটি উপায় আমাদের জানা আছে, তার মধ্যে অনুবাদ একদিক থেকে সবচেয়ে কার্যকরী। লেখক এবং তাঁর ভাষা যখন প্রাচীন, তখন তাঁকে সমকালীন

জীবনের মধ্যে সংকলিত করার কাজও এক অর্থে অনুবাদকেরই দায়িত্ব বলে স্বীকার্য, অনুবাদই সেই ঘটক, যার প্রণোদনার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন সাহিত্য একটা বৃহদায়তন স্থাবর সম্পত্তি নয়, যুগে-যুগে তা জঙ্গাম হয়ে ভাব-বাণিজ্যের যোগ্য বলেই আমরা তাকে 'ক্লাসিক' বা ধ্রুপদী নাম দিয়েছি এবং আমাদের আজকের দিনের সম্পূর্ণ এই ভিন্ন পরিবেশেও তার সংলগ্নতা বা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অনুবাদ সেই প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ করে তোলে। আর সেইজন্যই যুগে-যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়। যেহেতু ভাষাই সাহিত্যের বাহন, তাই কোনো একটি অনুবাদ চিরকাল ধরে পর্যাপ্ত বলে গণ্য থাকে না, প্রত্যেকটি যুগ তার সমকালীন ভাষার যে বিশেষ ভঙ্গির এবং ভাবনার যে বিশিষ্ট চরিত্রের জন্ম দেয়, তার মধ্যে দিয়েই পুরোনো অনুবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাগুলিতে গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যের প্রচুরায়ত অনুবাদ প্রতি যুগেই হয়ে আসছে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই ঘটেছে।

আবার অন্যভাবে দেখলে এটাই বলতে হয় যে, অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই অন্যভাষার মূল রচনা পড়া সম্ভবপর হয় না বলে অনুবাদের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় এক-একটি অনুবাদ এক-একটি দেশ বা মহাদেশের সাহিত্যের ধারা বদ্‌লে দিয়েছে, এমনকি যাঁরা মূল রচনার সঙ্গো পরিচিত, তাঁরাও অনেক সময়েই ভালো অনুবাদ পড়ে লাভবানই হন—কারণ ভালো অনুবাদ শুধুমাত্র মূল রচনার প্রতিনিধিত্বই করে না, তার যুগ ও অনুবাদকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাদও পাঠককে উপলব্ধি করায়। এখানে একটা তাত্ত্বিক প্রশ্নও অবশ্য ওঠে "গুড ট্র্যানস্লেশ্যন ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন" (ভালো অনুবাদ বস্তুতপক্ষে নতুন একটি রূপসৃষ্টিই) এই তত্ত্বগত অবস্থানটিকেও মেনে নিতে হয় সুসাহিত্যপাঠের খাতিরে। এই 'নতুন রূপসৃষ্টি' বা 'ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন' কিন্তু নির্বাধন স্বাধীনতার ছাড়পত্র দেয় না ; মূল সৃষ্টির ভাব সৌন্দর্যকে অনাহত রেখেই কিন্তু যে-সংস্কৃতি বলয়ের ভাষায় তার 'অনুবাদ'-তথা-'নতুন রূপায়ণ' করা হয়েছে, তার শৈলী ও রুচি মর্জিকে সেখানে সংলগ্ন করতে হবে। আন্তন চেখভের নাটক 'চেরি অর্চার্ড'-কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী'-তে যেভাবে রূপায়িত করেছেন, সেটি ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন-এর একটি ভালো নিদর্শন।

১.৩ সারাংশ

এই আলোচনার শুরুতেই, বিশ্বসংস্কৃতির ধারণার কথা হার্ডার-ই যে সর্বপ্রথম বলেন সে কথার উল্লেখ করেছি। এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়াতে ব্যর্থ হলে এবং অন্যদেশের সংস্কৃতির রস নিজের মধ্যে আহরণ না করতে পারলে, সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, একটি সংস্কৃতির আয়ত্তে অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গো বিনিময় করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক বিনিময় হবে। তবে বিনিময় করার সময় প্রত্যেক দেশের জাতীয় সংস্কৃতি নামক পৃথক চরিত্রকে বজায় রাখা প্রয়োজন। এইভাবে পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে এতটি ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হতে পারে, তেমনি একজন সাহিত্যিকও নিজের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং এভাবে সকলেই আমরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।

একজন সাহিত্যিকের পক্ষে যেমন বিভিন্ন ভাষা জানা সম্ভব নয়, তেমনি একজন মাত্র পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। তাই পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে গ্যেটে অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য অনুবাদ-ই সবচেয়ে কার্যকরী। প্রাচীন সাহিত্য যাকে আমরা 'ক্লাসিক' (ধ্রুপদী) নাম দিয়েছি, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেই প্রাচীন সাহিত্য সমকালীন সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। আর সেই কারণেই যুগে যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়।

১.৪ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১. অনুবাদচর্চার প্রয়োজন কেন, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।
২. গ্যেটে পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুবাদের আশ্রয় কেন নিতে চেয়েছিলেন, তা লিখুন।
৩. ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশে অনুবাদচর্চার গুরুত্ব বেশি কেন, সেটি বুঝিয়ে বলুন।
৪. শূন্যস্থান পূরণ করুন :
   (ক) প্রত্যেক দেশেরই আলাদা ভাবে—বলে একটা বিশেষ চরিত্র আছে।
   (খ) —পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে—আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন।

১.৫ অনুবাদ-চর্চার বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী

উনিশ শতকের বাংলাদেশের ভাবজীবনে যে-অভিনব চিন্তাতরঙ্গের আলোড়ন দেখা গিয়েছিল তা সাধারণভাবে রেনেসাঁস বা নবচেতনা নামে চিহ্নিত। ইংরেজ-অধিকার এই দেশের গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করল এবং তার ফলে পল্লীসংস্কৃতি শুকিয়ে গেল। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনের সহায়ক হল নতুন গড়ে ওঠা একটি ধনবান ও একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের (মূলত, ইংলন্ডেরই) সংস্কৃতি ছিল তাদের কাছে অনুকরণীয়, এর পাশাপাশি তারা বিজয়ী শাসকশ্রেণীর ব্যবহারিক সংস্কৃতিকেও অনুসরণ করতে থাকল। কাজেই দেখা গেল নবচেতনার কালে প্রাচীন সংস্কৃতির অবক্ষয়, ভাঙনের মধ্যে শূন্যস্থান পূরণের জন্য শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতিকে দুর্বলভাবে অনুসরণ (বা অনুকরণ) করাই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই অনুকরণের যা-যা উপজীব্য ছিল, তাদের মধ্যে আধুনিক যুগের বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শও দেখা যায়। অন্যভাবেও এই অনুকৃত সাহিত্য-সংস্কৃতির তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিৎকে নাড়িয়ে দিল, তেমনি আবার সেই ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নতুন বিরোধের বীজও লক্ষ করা গেল। যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল, তারাই আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিল। একারণে বিজয়ী সংস্কৃতির আদর্শ গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এইসময়

সেকালের উন্নত ও প্রগতিশীল মনীষীরা, যেমন রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রমুখ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চেয়েছিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কৃষ্টি-কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিরও সুপ্রতিষ্ঠ অবস্থানও তাঁদের বিশেষভাবে অভীপ্সিত ছিল। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আন্দোলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুসরণ দেখা দিয়েছিল আর পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুপ্রেরণায় তৈরি হওয়া নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সাহায্যে বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবরূপের অনুপ্রেরণায় নতুন একটি সাহিত্যধারা গড়ে উঠল। আর তারই অনুষঙ্গে অনুবাদেরও ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দিল। আধুনিক যুগেও বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা গভীরভাবে পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে যেভাবে অধ্যয়ন করে চলেছেন তা তাঁদের মৌলিক রচনায় যেমন উদ্‌ভাসিত হয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদচর্চাতেও তা প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর মূলত ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হল। এই সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নে অনুবাদই প্রধান অবলম্বন ছিল। সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকেই অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা শুরু হয় এই সময় থেকে।

১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরী রচিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' —'গস্‌পেল অব সেন্ট ম্যাথু'—ইংরেজি থেকে বাংলায় প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। এরপরে ১৮০৩-তে 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' নামে ঈশপের গল্প কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় রচিত হয়। বাংলা অনুবাদটি করেছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। ফোর্ট উইলিয়মের অন্যতম সেনানী সি. মংকটন ১৮০৯ সালে শেক্সপিয়রের 'দ্য টেম্পেস্ট' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র জে. সার্জেন্ট প্রথম বাংলায় পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্য অনুবাদ করেছিলেন। ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যের প্রথম সর্গ তিনি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদ করেন। এরপরে গিরিশচন্দ্র বসু ''ইলিয়াড''-এর প্রথম সর্গ এবং মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট'-এর অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হোমারের কাব্য 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' নামে অনুবাদ করেন। এই সময় হরিমোহন গুপ্ত পার্নেলের 'দ্য হার্মিট' কাব্যের অনুবাদ করেন। অনুবাদটির নাম 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান'। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় গোল্ডস্মিথ-এর 'ডেজার্টেড ভিলেজ'-এর অনুবাদ করেন 'পরিত্যক্ত গ্রাম' নামে। টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' কবিতার অনুবাদ—করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী এই নামে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭৫-তে ওয়াল্টার স্কটের 'দ্য ল্যে অব দ্য লাস্ট মিনস্ট্রেল'-এর অনুবাদ করেন রাখালদাস সেনগুপ্ত 'শেষ বন্দীর গান নাম' দিয়ে।

এরই পাশাপাশি আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই গদ্য, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটক রচনাতেও অনুবাদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অনুবাদমূলক। ১৮৭৬ সালে জোনাথন সুইফ্‌টের-এর 'গালিভার'স ট্রাভেল্‌স'-এর 'অপূর্ব দেশভ্রমণ' নাম দিয়ে উপেন্দ্রনাথ মিত্র অনুবাদ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'অদ্ভুত দিগ্বিজয় (প্রথম খণ্ড)' নাম দিয়ে বিখ্যাত স্পেনীয় লেখক সার্ভেন্তিসের 'দোন কীহোতে' (ডন কুইক্‌জোট) এবং 'মন্মথ

মনোরমা' (প্রথম খণ্ড) নাম দিয়ে হেনরি ফিলডিঙের 'আমেলিয়া'—এই গ্রন্থদুটির অনুবাদ করেন বিপিনবিহারী চক্রবর্তী। সেকালের ইংল্যাণ্ডের জনপ্রিয় রেনল্ডসের 'মিস্ট্রিজ অব দ্য কোর্ট অব লন্ডন'-এর কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে কথাসাহিত্যের অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তিনি ফরাসি বাষা থেকে বার্নাদ্যাঁ দ্য সাঁ পিয়ের-এর 'পোল এৎ ভির্জিনি'-র 'পৌলবর্জিনী' নামে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদের কথা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ছোটগল্প প্রথম চৌধুরীর 'ফুলজানি' ফরাসি লেখক প্রস্পার মেরিমির গল্প থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বিলিতি নাটকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভাবানুবাদ করেন হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ও ভেনিস'-এর ভাবানুবাদ করেন তিনি 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাম দিয়ে। ১৮৬৪-তে তিনি আবার শেক্সপিয়রের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' তাঁর হাতে পরিণত হয় 'চারুমুখ চিত্তহরা'-তে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি হোমারের 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যের আংশিক অনুবাদ করেন 'হেক্টর বধ' (১৮৭১) নামে। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে অনুবাদের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেক্সপিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের অনুবাদ করেন 'নলিনী বসন্ত' নাম দিয়ে। এরপরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিনি শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের অনুসরণে 'রোমিও জুলিয়েত' নাটক রচনা করেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি ইংরেজি কবিতাও অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—লংফেলোর রচিত 'সাম্ অব লাইফ'-এর অনুবাদ 'জীবন সঙ্গীত', আলেকজান্ডার পোপের 'এলয়সা টু আবেলার্ড'-এর প্রেরণায় 'মদন পারিজাত', শেলির 'দ্য স্কাইলার্ক'-এর অনুসরণে 'ভরতপক্ষীর প্রতি' (চাতকপক্ষীর প্রতি) ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। 'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি পুরো মূলানুগ, তবে 'মদন পারিজাত'-এ স্থানে স্থানে মূলানুগত্য লক্ষ করা যায়। 'ভরতপক্ষীর প্রতি', যা পরে হয়েছিল 'চাতকপক্ষীর প্রতি' কবিতাটিতে কবি মূল রচনাকে প্রায় পুরোপুরি-ই অনুবাদ করতে চেয়েছেন।

হেমচন্দ্রের পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র সেন শেক্সপিয়রের 'এ মিড সামার নাইট'স ড্রিম'-এর মর্মানুবাদ করেছিলেন। আরো পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত কিছু অনুবাদ করেছিলেন। যেমন-তাঁর 'গেছে' কবিতাটি ব্রাউনিঙ-এর একটি কবিতার আংশিক ভাবানুবাদ :

"এই পথ দিয়ে গেছে—এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ ফুলে চরণ—অলখিত রেখা ;
এই পথ দিয়ে গেছে ছিঁড়ে পাতা তুলে ফুল ;"

"This path so soft to pace shall lead
Thro' the magic of May to herself indeed?"

এরপরে আমরা চলে আসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদচর্চার প্রসঙ্গে। পাশ্চাত্যের বহু কবিতার অনুবাদ তিনি করেছিলেন। দীর্ঘ আট বছর ধরে তাঁর এই অনুবাদচর্চা প্রসারিত ছিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে কবি 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেন। তবে সেটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ইচ্ছামতো

কবি এখানে শব্দের পরিবর্তন করেছেন। যেমন— "The rumpfed ronyon cries"-এর বাংলা করা হয়েছে "পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে"। তবে ডাইনিদের সংলাপের মূল ভাব অনুবাদের ভাষায় আশ্চর্য রকমভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এর পাশাপাশি তিনি ম্যূর, বায়রন, বার্নস প্রভৃতি কবির বিভিন্ন কবিতা অনুবাদ করেছেন। যেমন—'বিচ্ছেদ' কবিতাটি ম্যূরের 'As Slow Our Ship'-এর অনুবাদ। 'বিদায় চুম্বন' কবিতাটি বার্নসের 'As Fond Kiss' কবিতার অনুবাদ। বার্নসের 'O philly, Happy be that day' কবিতার অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন 'ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)'।

অনুবাদচর্চায় রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুবাদ প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (১ম) প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল। তাঁর অনুবাদের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল ইংরেজি সাহিত্য আস্বাদন এবং শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যরস পৌঁছে দেওয়া।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—শেলি, কীটস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইনবার্ন, ব্রাউনিং, এডগার অ্যালান প্যো, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রমুখ পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকদের লেখার পাশাপাশি, সংস্কৃত, ফরাসি, চিনা, জাপানি, তামিল ইত্যাদি ভাষা থেকে এবং ডিরোজিও, তরু দত্ত-প্রমুখ এদেশি ইংরেজি কবিদের লেখারও কিছু অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি অনুবাদ সংকলন হল : 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' এবং 'মণিমঞ্জুষা'।

এতক্ষণ আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এবার আসি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে। উনিশ শতক নবজাগরণের যুগ। এযুগে শিক্ষিত বাঙালিরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বিদেশি ভাবধারাকে গ্রহণের পাশাপাশি নিজের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের গরিমা আবিষ্কারও করতে চেয়েছেন এবং এর ফলেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদচর্চা শুরু হয়েছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শাখা। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদির বঙ্গানুবাদকে প্রাচীন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে কিছু কারণ উল্লেখিত হয়ে থাকে। প্রথমত, তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখা যায়, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপিত করার জন্য সংস্কৃত থেকে মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হল। সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ধর্মের উপর রাজশক্তির আক্রমণে, একসময় ব্রাহ্মণ্য বিধিশাসিত হিন্দুসমাজ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণজনিত উত্তালতা কিছুটা শান্তরূপ ধারণ করলে সমাজে আবার শিল্প-সংস্কৃতির জোয়ার এলো। অনুবাদ-সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থগুলি, তুর্কি বিজয়ের প্রথম দু-শতকের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার অবসানের পরে এবং চৈতন্য-প্রভাব বিস্তারিত হবার আগে রচিত হয়েছিল। তুর্কি-বিজয়ের ফলে পরাজিত হিন্দুশক্তি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। এই প্রতিরোধের মূল কথা ছিল উপরতলার ব্রাহ্মণ্য-বৈদিক-স্মার্ত-পৌরাণিক ধারার সঙ্গে লোকজীবনে প্রচলিত অব্রাহ্মণ্য-অবৈদিক-অস্মার্ত-অপৌরাণিক ধারার মিশ্রণ। এই মিশ্রণের ফলে যে নতুন ভাবধারা গড়ে উঠেছিল, তার সামনে পৌরাণিক আদর্শ তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের উত্তরাধিকারী। তাই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত

ভাষায় রচিত গ্রন্থের প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ। হিন্দু সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যেই নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পৌরাণিক সাহিত্য—বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের প্রচারের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত যা কিনা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল তা জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে একদম জড়িয়ে যাবার সুযোগ পেল।

দ্বিতীয়ত, গৌড়ের সুলতানেরা সিংহাসনে সুস্থির হয়ে রাজসভার পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার যখন আগ্রহ দেখান, তখন থেকেই এসব গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতার-তুরকি-খোরাসানি-পাঠান-মুসলমানরা প্রথম দিকে দূরত্ব বজায় রেখে এদেশকে শাসন করলেও ধীরে ধীরে তাঁরা এদেশকে ভালোবেসে, এদেশের ভাষা শিখে, এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অনেক সুলতান-ই হিন্দু পণ্ডিতদের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতে চাইতেন এবং অনেক সময় তাঁরা সেগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতেও উদ্বুদ্ধ করতেন। বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাসকার ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছিলেন, "মুসলমান, ইরান, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল। গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।" মালাধর বসু তাঁর গ্রন্থে সুলতান বারবক শাহের কথা বলেছেন। আবার কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী ছুটি খাঁর সভাকবি ছিলেন। অবশ্য এঁরা দুজনেই মুসলমান সুলতানের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ আনুকূল্য পেয়েছিলেন। এই সমস্ত মুসলমান নৃপতিরা মহাভারতের কাহিনীর প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের এই যুগকে হুসেনশাহী যুগ নামে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয়ত, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনি কবিদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা এগুলি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে শুধু সুলতান বা নৃপতিদের আনুকূল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কাব্য রচনা করেছিলেন তা নয়, কাব্যগুলির সাহিত্যগুণে মুগ্ধ হয়েও সেগুলি অনুবাদে আগ্রহী হয়েছিলেন।

প্রথমযুগে রচিত এইসব অনূদিত গ্রন্থের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—সেই সময় বাঙালি কবিদের সামনে কালিদাসের বিখ্যাত সব কাব্য, নানারকম পুরাণ ইত্যাদি থাকলেও, তাঁরা প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থগুলির অনুবাদই বেশি করেছেন। কারণ কাব্যসৌন্দর্য অপেক্ষা ধর্মীয় মাহাত্ম্যের দিকেই তাঁরা বেশি আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালেও অনুবাদের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ করা যায়।

প্রথম যুগের অনুবাদকরা অনুবাদ করার সময় মৌলিক চিন্তা অপেক্ষা, মূল গ্রন্থের যে অনুসরণ করতে চাইবেন, তা ছিল স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তাই। কৃত্তিবাস ছাড়া অন্য কবিরা, যেমন—মালাধর বসু, শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রমুখ মোটামুটি ভাবে মূল গ্রন্থকেই অনুসরণ করেছেন। তবে মালাধর বসু মূল ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেছিলেন।

তবে বাংলাভাষায় সংস্কৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এর ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধিশালিনীও হয়েছে এবং বাংলা ভাষার সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় কয়েকটি উপনিষদ্ ও বেদান্তের অনুবাদ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী করেছিলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ। নবীনচন্দ্র দাস রঘুবংশের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। এর পাশাপাশি কালিদাসের প্রতিটি কাব্যের অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া পাণিনির ব্যাকরণ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অমরকোষ, সাহিত্যদর্পণ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থও অনুবাদ হয়েছে। -ত্ত

ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি পালি ও প্রাকৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা ভাষায় হয়েছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কল্পসূত্র, জগৎরাম ভট্টাচার্যের দশবৈকালিক সূত্র, রাধাগোবিন্দ বসাকের গাথাসপ্তশতীর অনুবাদ সর্বজনবিদিত। ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতকের অনুবাদ তো বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

❐

এতক্ষণ আমরা ইংরেজি ও সংস্কৃত অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশধারা নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসি অনুবাদের প্রকার পদ্ধতি নিয়ে। অনুবাদের পদ্ধতি অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন : আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, আংশিক অনুবাদ, বিকৃত অনুবাদ, কবিতার অনুবাদ ইত্যাদি। এখানে আমাদের আলোচ্য আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ এবং কবিতার অনুবাদ ঃ

(১) **আক্ষরিক অনুবাদ** : যে-সমস্ত অনুবাদে মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়, তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বা মূলানুবাদ বলে। আক্ষরিক অনুবাদে শব্দ ও তার নিজস্ব প্রয়োগগত অর্থ বজায় রেখে তার দ্বারা ভাষান্তরে শব্দের নির্মাণ ঘটায়। প্রাচীন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি খুব একটা গৃহীত হয়নি। ইংরেজি থেকে বাংলায় করা কিছু অনুবাদে আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'I saw in Luisiana a live oak growing' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪১, বৈশাখ সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'-তে 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। এখানে প্রথমে মূল ইংরেজি কবিতাটি উল্লেখ করে, রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদটি দেওয়া হল।

"I saw in Luisiana a live oak growing,
All alone stood it and the moss hung down from the branches.
Without any companion it grew there uttering joyous leaves of dark green,
And its look, rude, unbending, lusty, made methink of myself,
But, I wonder'd how it could utter joyous leaves standing.
Alone there without its friend near, for I knew I could not.
And took off a twig with a certain number of leaves upon
It, and twined around it a little moss.

And brought it away, and I have placed it in sight in my room,
It is not needed to remind me as of my own dear friends.
(For I believe lately I think of little else than of them)
Yet it remains to me a curious token, it makes me think of manly love,
For all that, and though the oak glistens there in
Luisiana solitary in a wide flat space,
Uttering joyous leaves all its life without a friend a lover near,
I know very well I could not.”

“লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠেছে
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোন দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন করে এ গাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে ভরা আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর
আমি বেশ জানি আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলাম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ওই বন্ধুদের ছাড়া আর কোন কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝলমল করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে চিরজীবন ধরে,
তবু আমার মনে হয়, আমি তো পারতুম না।”

অনুবাদটি সম্পূর্ণ মূলানুগ। এমন মূলানুগ অথচ কাব্যরসান্বিত অনুবাদ খুব কম পাওয়া যায়। অনুবাদে কবি মূলের প্রায় প্রতিটি শব্দেরই যথার্থ রক্ষা করেছেন। এমনকি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ যে সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তা-ও মূল ভাবের অনুসারী। যেমন—

“....uttering joyous leaves of dark green.”—

পংক্তিটির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"...ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।"—

এই অনুবাদ একই সঙ্গে স্বচ্ছন্দ এবং কঠিন মূলানুগত্যের বাঁধনে বাঁধা।...হয়ত কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এমন সুন্দর ও মূলানুগত অনুবাদ করা সম্ভব—যা সেই পূর্বোল্লিখিত ইতালীয় প্রবচনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে!

(২) **ভাবানুবাদ** : এতে মূলের অবিকল অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে বক্তব্যের ভাব বজায় রেখে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে তা পরিবেশন করা হয়। এমনকি এখানে ভাষা সম্পর্কেও অনুসরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের যে বিশাল অনুবাদ সম্ভার এদেশে গড়ে উঠেছিল তাতে ভাবানুবাদ-ই বেশি পাওয়া যায়। তবে এইসব গ্রন্থে কবিরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে অনুসরণ করলেও, অনেক সময় নিজের ইচ্ছামতোও কাহিনিকে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে কৃত অনুবাদের সময়ে ভাবানুবাদেরই আধিক্য লক্ষ করা যায়। এখানে বার্নসের "O Philly, happy be that day" কবিতা এবং তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)" কবিতা মিলিয়ে দেখা যায় :

"HE O Philly, happy be that day
When roving through the gather'd hay
My youthful heart was stown away
And by thy charms my philly.

SHE O Willy, aye I bless the grove
Where first I own'd my maiden love,
Whilst thou didst pledge the powers above
To be my ain dear Willy.

HE As songsters of the early year
Are ilka day mair sweet to hear,
So ilka day to mair dear,
And charming is my Philly.

SHE As on the brier the budding rose
Still richer breathes and fairer blows
So in my tender bosom grows
The love I bear my Willy.

HE The milder sun and bluer sky
That crown my harvest cares wi'joy
Were ne'er so welcome to my eye
As is a sight of Philly.

SHE The little swallow's want on wing,
Though wafting o'er the flowery spring
Did ne'er to me sic tidings bring
As meeting O' my Willy.

HE The bee that through the sunny hour
Sips nectar in the opening flower,
Compared wi' my delight is poor
Upon the lips of Philly.

SHE The woodbine in the dewy weet,
When evening shades in silence meet,
Is nocht sae fragranter say sweet
As is a kiss O' Willy,

HE Let fortune's wheel at random rin,
And fools may tyne, and knaves may win
My thoughts are a' bound up in one,
And that's my ain dear Philly.

SHE What's a' the joys tha gowd can gie?
I care na wealth a single flie;
The lad I love's the lad for me
And that's my ain dear Willy."

"ললিত। হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন,
দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন!
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন!

নলিনী। কত ভালোবাসি সেই বনেরে ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা লয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।

ললিত। বসন্ত-বিহগ যথা সুললিত ভাষী
যত শুনি তত তার ভালে লাগে গীতধার
যতদিন যায় তত তোরে ভালোবাসি
যতদিন যায় তব বাড়ে রূপরাশি।

নলিনী। কোমল গোলাপ কলি থাকে যথা গাছে
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত
এ হৃদয় ভালোবাসা আলো করে আছে
সঁপেছি সে ভালোবাসা তোমারিগো কাছে।

ললিত। মৃদুতর রবিকর সুনীল আকাশ
হেরিলে শস্যের আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।

নলিনী। মধু আগমনে বার্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত
মিলিলে তোমারি সাথে প্রাণের ললিত।

ললিত। কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয়ভরে, হরষে চুম্বন করে

সে কি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধরখানি করি গো চুম্বন ?

নলিনী। শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হাসিত
বিজন সন্ধ্যার বায়ে ফুটে সে মলয়বায়ে
সে এমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।

ললিত। ঘুরুক অদৃষ্টচক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক রসাতলে কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানি ওগো প্রিয়া।

নলিনী। ধন র- কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয়ধনের আমি দরিদ্র ভিখারি
সে প্রণয়, ললিত গো তোমারি তোমারি।"

এটি মূল কবিতার মোটামুটি ভাবানুবাদ হয়েছে। মূল কবিতার 'He' এবং 'She' অনুবাদে 'ললিত' ও 'নলিনী' হয়েছে। অনুবাদে মূলের স্তবক রক্ষিত হয়েছে। এমনকি মূল কবিতার ছন্দস্পন্দনও অনুবাদে ধরা পড়েছে। শেষ স্তবকেও প্রথম দু'চরণের ভাবানুবাদ হয়েছে।

(৩) কবিতার অনুবাদ :

কবিতার অনুবাদ যেমন আক্ষরিক হতে পারে, তেমনি ভাবানুবাদও হতে পারে। এখানে বার্নসের 'Ae Fond Kiss' কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের অনূদিত 'বিদায় চুম্বন' কবিতাটি দেওয়া হল।

"Ae fond kiss, and then we sever;
Ae farewel and then, forever!
Deep in heart, wrung tears, I'll pledge thee
Warring sighs and groans I'll wage thee
Who shall say that fortune grieves him.
While the star of hope she leaves him?

Me, nae cheerful twinkle lights me;
Dark despair around be nights me.
I'll ne'er blame my partial fancy,
Nae thing could resist my nancy;
But to see her and love for ever.
Had we never loved but kindly,
Had we never loved sae blindly,
Never met or never parted,
We have never been broken hearted
Fare thee well, thou first and fairest!
Fare thee well, thou best and dearest!
Thine be like joy and treasure.
Peace, enjoyment, Love and Pleasure!
Ae fond kiss and then we rever."

"একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
জনমের মতো দেখা হবে নাকো আর
মর্মভেদী অশ্রু নিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
দুখের নিশ্বাস আমি দিব উপহার।
সেতো তবু আছে ভালো, একটু আশার আলো
জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার,
কিন্তু মোর আশা নাই যে দিকে ফিরিয়া চাই
সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।
ভালো যে বেসেছি তারে দোষ কী আমার ?
উপায় কী আছে বল উপায় কী তার ?
দেখামাত্র সেই জনে ভালোবাসা আসে মনে
ভালোবাসিলেই ভুলা নাহি যায় আর।
নাহি বাসিতাম যদি এত ভালো তারে
অন্ধ হয়ে প্রেমে তার মজিতাম নারে
যদি নাহি দেখিতাম বিচ্ছেদ না জানিতাম
তা হলে হৃদয় ভেঙে যেত না আমার।

আমারে বিদায় দাও যাই গো সুন্দরী,
যাই তবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাকো তুমি থাকো সুখে, বিমল শান্তির বুকে
        সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

এই অনুবাদটি মূল কবিতার আক্ষরিক অর্থ, বাক্য পরম্পরা এবং ভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

১.৬ সারাংশ

উনিশ শতকে বাংলাদেশের ভাবজীবনে রেনেসাঁস বা নবচেতনা দেখা গিয়েছিল। এই সময় সেকালের উন্নত ও প্রগতিশীল মনীষীরা ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে শিক্ষা-সংস্কৃতি আন্দোলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুসরণ দেখা দিয়েছিল, আর পরবর্তী অর্ধে এই অনুসরণের ফলে গড়ে ওঠা নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সাহায্যে বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জন্য নতুন সাহিত্য গড়ে উঠল। আর এই প্রয়োজনেই অনুবাদের ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন হল। সংস্কৃত, ফরাসি ও ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকে অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা শুরু হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরির 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' ইংরেজি থেকে করা প্রথম অনুবাদ। বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অনুবাদমূলক। এর পাশাপাশি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্রমথ চৌধুরী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এরপরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্যের বহু সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। ছোটবেলার গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে কবি 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেন। তবে অনুবাদটি আক্ষরিক নয়। এর পাশাপাশি তিনি ম্যূর, বায়রন, বার্নস প্রমুখ কবির বিভিন্ন কবিতাও অনুবাদ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কিছু অনুবাদ করেছিলেন।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যেরও কিছু অনুবাদ হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল।

এই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে কয়েকটি কারণ ধরা হয় তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখা যায়, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপিত করার জন্য সংস্কৃত-পুরাণাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়। আরেকটি মতে,—গৌড়ের সুলতানরা সিংহাসনে বসে রাজসভার পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার আগ্রহ জানালে এসব গ্রন্থের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৃতীয় একটি মতে,—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনি কবিদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা কাব্যগুলির সাহিত্যরসে মুগ্ধ হয়ে সেগুলির অনুবাদ করেছিলেন।

ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি পালি এবং প্রাকৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদও বাংলায় হয়েছে। যেমন—কল্পসূত্র, দশবৈকালিক সূত্র, গাথাসপ্তশতী ইত্যাদি।

অনুবাদ নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন—(১) আক্ষরিক অনুবাদ। এই ধরনের অনুবাদে মূল রচনার আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়। (২) ভাবানুবাদ—এই ধরণের অনুবাদে বক্তব্যের ভাব বজায় রেখে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে তা পরিবেশন করা হয়। (৩) কবিতার অনুবাদ—এই অনুবাদ আক্ষরিকও হতে পারে আবার ভাবানুবাদও হতে পারে। এছাড়াও আংশিক অনুবাদ, বিকৃত অনুবাদ ইত্যাদিও লক্ষ করা যায়।

১.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন :

১. অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২. বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদচর্চা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের উদ্ভবের মূলে কী-কী কারণ স্বীকৃত হয়ে থাকে?

৪. আক্ষরিক অনুবাদ বলতে কী বোঝায়, সংজ্ঞা সহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভাবানুবাদ কাকে বলে উল্লেখ করে উদাহরণ দিন।

৬. কবিতার অনুবাদ বলতে কি বোঝায়; উদাহরণ দিন।

৭. **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

ক) ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

খ) বাংলা ভাষার—ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের—অনুবাদমূলক।

গ) কথাসাহিত্য অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন—।

ঘ) 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি ম্যুরের—এর অনুবাদ।

ঙ) রমেশচন্দ্র দত্ত—অনুবাদ করেছিলেন।

৮. **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :**

ক) 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' গ্রন্থটির রচয়িতা—

১. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২. তারিণীচরণ মিত্র

৩. হরিমোহন গুপ্ত

খ) বিপিনবিহারী চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন—

১. অপূর্ব দেশভ্রমণ

২. অদ্ভুত দিগ্বিজয়

৩. পরিত্যক্ত গ্রাম

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)' কবিতাটি—

১. আক্ষরিক অনুবাদ
২. ভাবানুবাদ
৩. কবিতার অনুবাদ

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১. কালিসাধন মুখোপাধ্যায় — পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ
২. বুদ্ধদেব বসু — কালিদাসের মেঘদূত
৩. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় — সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ২ ❐ অনুবাদের সমস্যা এবং সমাধান

২.১ প্রস্তাবনা
২.২ অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে (১)
২.৩ সারাংশ
২.৪ অনুশীলনী
২.৫ অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে (২)
২.৬ সারাংশ ২
২.৭ অনুশীলনী ২
২.৮ উত্তরমালা
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে অনুবাদ করতে গেলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেগুলি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসগত বিভিন্ন দিক থেকে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা আছে। এছাড়া কবিতার অনুবাদকালে শিল্পরূপায়ণ এবং ছন্দগত দিক থেকে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাও এখানে বলা আছে। প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়, তার কথাও এখানে পাওয়া যাবে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে অনুবাদের সমস্যার নানা ধরণের সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদের সার্থকতার পেছনে পাঠকের যে একটা বড় ভূমিকা থাকে, সে কথাও এখানে বলা হয়েছে। অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন এবং পরিমার্জনা করতে হয়। এইভাবে অনুবাদ করলে অনুবাদক ও রচনাকারের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না, ফলে অনুবাদকের মাধ্যমে মূল রচনার যেন নবজন্ম (transcreation) হয়ে থাকে এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্প হয়ে ওঠে।

আপনি এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। বিষয়বস্তুও সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। ভালো করে এককটি পাঠের পরে অনুশীলনীগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

২.২ অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে (১)

আগের এককের মধ্যে আমরা অনুবাদের চর্চা কেন করা হয় এবং অনুবাদের নানা প্রকার প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা অনুবাদ করতে গেলে যে-যে সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সেইসব সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব।

দেশ-কালের দূরত্ব দূর করবার জন্য যে কয়েকটি উপায় আছে, তার মধ্যে অনুবাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একটি ভাষা থেকে, অনুবাদক যখন কোনো গদ্য বা পদ্য অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে যান, তখন দেখা দেয় নানারকম অভাবিতপূর্ব সমস্যা। এই সমস্যা নানাভাবে দেখা দিতে পারে। যেমন—ভাষাগত দিক থেকে, ভাবগত দিক থেকে, শব্দবিন্যাসের দিক থেকে ইত্যাদি।

এবারে আমরা অনুবাদ করতে গেলে যে-যে সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

অনুবাদকের উদ্দেশ্য যতটা পরিমাণে মূল লেখকের উদ্দেশ্যের সমধর্মী হয়, অনুবাদকের শিল্পপ্রকরণও ততটা পরিমাণে মূলানুগত হয় এবং অনুবাদ হয় সার্থক। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদচর্চার ব্যাপারটি দেখানো যেতে পারে। তাঁর অনুবাদ কর্মের প্রথম দিকে পাওয়া যায় 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাইনিদের সংলাপ। এ অনুবাদ তাঁর ভাষাশিক্ষার অঙ্গ ছিল, ভাষার চর্চাই ছিল এখানে মুখ্য। যদিও তিনি পুরো 'ম্যাকবেথ' নাটকটিই অনুবাদ করেছিলেন, তবু এই অংশটি ছাড়া বাকিটা লুপ্ত। এই অনুবাদে দেখা যায় শব্দগত দিক থেকে অনুবাদক যথেষ্ট য-বান। অনুবাদের কয়েক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ নিজে কিছু গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—শেক্সপিয়রের লেখাতে রয়েছে : "Give me" quoth I / "Aroint thee' witch!" the rumpfed ronyon cries. এটাই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে করেছেন এভাবে : চাইলুম তার কাছে গিয়ে / পোড়ামুখী রেগে / 'ডাইনী মাগী, যা তুই ভেগে'...আক্ষরিক শব্দানুবাদ করেননি তিনি। কিন্তু মূল ভাবরূপের নিখুঁত এক অনুবাদ করা হয়েছে এখানে। এর ফলে অনুবাদ হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত। ফলে মূল নাট্যরচনার সংলাপের প্রতি অনুবাদকের আকর্ষণ মূল নাট্যকার ও অনুবাদকের উদ্দেশ্যকে এক করেছে।

সুতরাং যেমন মৌলিকরচনায়, তেমনি অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি জরুরি প্রশ্ন হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। বাংলা ভাষার লেখকের পক্ষে সমস্যাটিকে এভাবে দাঁড় করানো যায়—লেখার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার শব্দের মাত্রাবিতরণ কী রকম হবে, কাব্যিক রীতি বা পুরোনো ভাষা কোন্ পর্যন্ত প্রশ্রয় পাবে ?

দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে প্রতিটি শব্দেরই আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে না। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও তার ভাষান্তরিত প্রতিশব্দের একই রকম মিল পাওয়া অসম্ভব। এছাড়া বাক্য রচনাতে ইংরেজির সঙ্গো বাংলার পার্থক্য এই যে, বিশেষণ বাক্যাংশ (অর্থাৎ Adjective clause) বাংলায় কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তারপরে আসে বিশেষণ-বাক্যাংশ। যেমন, বাংলাতে বলা হয়— "Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা নীল নদের জলে স্নান করিতেছিল।" এখানে "সুন্দরী বালিকা" কর্তৃপদ। "Rhodopis নামে" তার আগে বসেছে। কিন্তু ইংরেজিতে তা পরে বসে— "A beautiful girl named Rhodopis" সমস্তটা মিলে

কর্তা। ইংরেজিতে সাধারণত কর্তার কিছু পরে, কখনো বা আগে ক্রিয়াপদ বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে। ইংরেজিতে 'স্নান করিতেছিল' ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরেই বসবে। তা হলে বাক্যটা এরকম হবে "A beautiful girl named Rhodopis was bathing" বাংলায় 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ নেই—আমরা 'জলগুলি' কখনোই বলি না, ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতেও 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ হতে পারে, এখানে তাই হয়েছে। "A beautiful girl named Rhodopis was bathing in the water of the Nile". 'River' শব্দটি এখানে না দিলেই ভালো হয়।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে কঠিনতম সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। যে-কোনো শিল্প অতি জটিল, গভীর, রহস্যময়। যেমন—কবিতার শিল্প। কবি তাঁর আবেগ ও চিন্তাতরঙ্গাকে সংহত ও ঘন করে তোলেন রূপগ্রাহ্য চিত্রে—যাতে কবির বিশিষ্ট অনুভূতির অভিজ্ঞতা অন্য সব সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা ও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। এই 'চিত্র' হল—কবির মনের সকল স্মৃতি-অনুষঙ্গা থেকে নির্মিত 'চিত্রকল্প' (অর্থাৎ, image)। কবিতাটি এই সবের অচ্ছেদ্য সমন্বয় ও সৌষম্যে অনবদ্য হয়ে ওঠে। এই শিল্পরূপের অনুসরণ অনুবাদের সার্থকতায় যেমনই মূল্যবান তেমনই সমস্যা-সংকুল। এই ধরণের সমস্যা সাধারণত কবিতার অনুবাদকরাই উপলব্ধি করেছেন।

কবিতার অনুবাদকালে ছন্দগত দিক থেকেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। সাধারণত শব্দবিন্যাসে এক ভাষার সঙ্গো অন্য ভাষার উচ্চারণের রীতি অনুসারে 'ঝোঁক' (stress)-এর একটা পার্থক্য থাকে। লাতিন কবিতায় প্রচুর স্বরাঘাত থাকে এবং সে স্বরাঘাতের নানা নিয়মও থাকে নির্দিষ্ট। কিন্তু ইংরেজি পদ্যছন্দে কানে শোনা স্বরের দৈর্ঘ্যের ওপর স্বরাঘাতের পরিমাণ নির্ভর করে। সেইজন্য এক ভাষার কবিতার ছন্দকে অন্য ভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়। তবে যদি দুটি ভাষার মধ্যে শব্দব্যুৎপত্তি, বিশিষ্ট বাক্‌রীতি, ধাতু ও ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকে, যেমন ইংরেজির সঙ্গো ফরাসি বা জার্মান ভাষার, অথবা সংস্কৃতের সঙ্গো প্রাকৃতের ও বাংলা ভাষার, সেখানে মূল ছন্দ অনুবাদ করা তেমন কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় 'মেঘদূত' এবং 'গীতগোবিন্দ'-এর আংশিক অনুবাদে আর বিদ্যাপতির দু-একটি পদের অনুবাদে মূল কবিতার ছন্দ রক্ষা করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও দুই ভাষার মধ্যে ঝোঁকের পার্থক্য আছে। বাংলায় প্রতিটি অক্ষরের মাত্রা সমান। অক্ষরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। তাই বাংলা রীতি অনুসরণ করলে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় রক্ষা করা যায় না।

আবার ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের গঠনেও শব্দোচ্চারণ রীতির পার্থক্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গো রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক এন্ডারসনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন—"ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই ছন্দসংগীত মুখরিত হইয়া ওঠে...বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে এক সঙ্গো অনেকগুলো শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গো সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না।" যেমন এডগার অ্যালান পো-র 'র‍্যাভেন' কবিতার এই দুটি চরণের অনুবাদ

"Ah, distinctly I remember
It was in the bleak December"

রবীন্দ্রনাথ এভাবে করেছেন,—

"আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাঝে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, ইংরেজি ছন্দটি চৌপদী বলে ধরে একটি ঝোঁকে তিনি চার মাত্রা ধরে অনুবাদ করেছেন, ইংরেজি ছন্দে এভাবে চার মাত্রা ধরা যায় না। তাই ইংরেজি শব্দের স্বাভাবিক ঝোঁক বাংলায় নেই বলে—অনুবাদটি মূল কবিতার ধ্বনিরূপ ও ছন্দের প্যাটার্ন রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের বাংলা রূপায়ণ অমিত্রাক্ষর। কিন্তু বাংলা ধ্বনিপ্রবাহে ইংরেজির মতো ঝোঁক না থাকায় ইংরেজি ছন্দের যথার্থ প্রতিরূপ বাংলায় প্রায়শই পাওয়া যায় না। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের প্রতি চরণের শেষে একটি ধ্বনির অনুরণন থেকেই যায়। বাংলা ছন্দে তা পাওয়া যায় না। তাই অনুবাদের সার্থকতার জন্য মূল ছন্দ অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্বাধীনতা কিছুটা পরিমাণে মেনে নিতেই হবে। আবার পদ্যের অনুবাদ গদ্যে পরিবেশন করতে গেলেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। একটি কবিতার মূল ভাব গদ্যে অনুবাদ করা হলে কবিতার অর্থ, শব্দ রক্ষা করা গেলেও সেখানে কবিতার যে একটা তান আছে, তা পাওয়া যায় না। তাই সেখানে কোনো ভাষার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদ কখনোই মূলানুগত্য রক্ষা করতে পারে না। করাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ তাতে রসের উপলব্ধিটাই ব্যাহত হবে। তবে সতর্ক অনুবাদক যদি মূল কবিতার চলনকে অনুবাদে অন্তত কিছুটাও প্রতিধ্বনিত করতে পারেন, তাহলে ছন্দগত পার্থক্যটুকু অনেকটাই কমে আসে। যেমন

"উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রোদ্রে
চঞ্চল পাখ্‌নায় উড়ছে
নিঃসীম ঘন নীল অম্বর
গ্রহ তারা থাকে যদি
থাক নীল শূন্যে।

বিমলচন্দ্র ঘোষের এই কবিতা, "দুলকি চালের মাত্রাবৃত্ত" : ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৪, ৪ + ৪ + ৪ + ৩, এই ভাবে চলেছে। এই চলন্‌টাকে ধরেই অনুবাদককে এগোতে হয় এভাবে—

"A glitt'ring group of pigeons
Gliding beneath the sun-rays
Restless wings are gliding
Sapphire cosmos unbarr'd
Let stay planets and starlets, let stay."

(পল্লব সেনগুপ্ত)

—মূলত চতুর্মাত্রিক (শেষ পর্বে ত্রিমাত্রিক) আয়াম্বিক ছন্দের মাধ্যমে এটা করা গেছে বলেই মূলের তাল ও সুর দুইই অনেকটা প্রতিফলিত হতে পেরেছে এই অনুবাদে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল প্রতিশব্দের ব্যবহার। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার বহু শব্দ প্রায় একইরকম। তবু অনুবাদ করতে গেলে মূল ভাব সবসময় বজায় রাখা যায় না যে, তা অনুবাদ বিশেষজ্ঞ জে. ও'ব্রায়েন সুন্দর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। টি.এস. এলিয়টের "rats' feet over broken glass"-এর সঠিক ফরাসি অনুবাদ "La course des rats sur les debris de verre." এটি আক্ষরিক ভাবে মূলের অনুবাদ হল না। "La course des rats" মানে ইদুঁরের পা নয়, ইদুঁরের চলা। এখানে "Les pattes" বললে ইদুঁরের পা থাকবে, কিন্তু চঞ্চলতা থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম জীবনে "Woodbine"-কে "মল্লিকা" করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে 'সাধনা'-য় হাইনের একটি অনুবাদে "নীল বায়োলেট নয়ন" বলে বিদেশি শব্দই ব্যবহার করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যার কথাও বলতে হয়। কবি স্বয়ং যদি তাঁর কোনো লেখার অনুবাদে ব্রতী হন, তাহলেও যে এ-ধরনের কিছু সমস্যা হবে না এমন নয়। ফলত, অন্য কেউ অনুবাদ করতে গেলে, তিনি মূলের প্রতিটি শব্দ, চিত্রকল্প, বাক্‌প্রতিমা ইত্যাদি সম্পর্কে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করবেন (অন্তত করতে চেষ্টা করবেন) সেটা কবি স্বয়ং অনুবাদ করলে সম্ভাব্য নয় যে, তার প্রমাণ জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার স্ব-কৃত অনুবাদ।

উদাহরণ হিসেবে দেখুন :

১(ক) "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"

(খ) "At moments when life was too much of sounds
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom."

কবির স্ব-কৃত এই অনুবাদে "ক্লান্ত প্রাণ" এবং "জীবনের সমুদ্র সফেন" নিরুদ্দেশ এবং "দু-দণ্ড শান্তি"-র বদলে "wisdom" ব্যবহৃত হয়ে ছবিটাই বদ্‌লে গেল। অথচ, দ্বিতীয় কোনো অনুবাদক এখানে যে রকম করেছেন, তা প্রায় মূলানুগ :

(গ) "I'm a weary soul : the foamy waves of life wafted at large
I had a momentary bliss with Banalata; she came from Natore."

২(ক) ".....বলেছে সে, এত দিন কোথায় ছিলেন?"
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

(খ) "I have also seen her, Banalata Sen of Natore."

মূলে, বনলতার ঐ প্রশ্ন এবং পাখির নীড়ের সঙ্গে উপমিত তার চোখে—এই দুয়ে মিলে যে-বাক্‌প্রতিমা গড়েছে, সেই অনবদ্য ভাবনাটি কবির নিজের অনুবাদে একেবারে নিশ্চিহ্ন! অথচ, অন্য অনুবাদক সেটাকে সাধ্যমতো রাখারই প্রয়াসী হয়েছেন :

(গ) "…..She, lifting her nestling eyes
Asked me, 'Where hast thou been so long, Monsieur?'
She, that Banalata of Natore."

—"এতদিন কোথায় ছিলেন?"-এর মধ্যে সম্বোধনের দূরত্ব এবং সম্পর্কের নৈকট্য যেভাবে সমন্বিত আছে, অনুবাদে সেটা মেলানো অত্যন্ত দূরহ; তবু ফরাসি 'মঁসিয়ে' খানিকটা কাছাকাছি যায়, যা ইংরেজি 'স্যার'-এ আসে না। "নেস্‌লিং আইজ" "পাখির নীড়ের মতো চোখ"—এর ভাবানুবাদ; 'নেস্ট-লাইক' বা 'নেস্টলি' করলে—মূলের আরও কাছাকাছি যেত ঠিকই, কিন্তু প্রথম শুদ্ধ হলেও গদ্যময়, দ্বিতীয়টি শ্রুতিমধুর বটে, কিন্তু অশুদ্ধ শব্দ! [(গ)-অংশগুলি পল্লব সেনগুপ্তের অনুবাদ]

আসলে, নিজের কবিতা নিজে অনুবাদ করলে প্রায় ক্ষেত্রেই যে, সেটি 'অনুবাদ' না হয়ে নূতন একটি কবিতায় পরিণত হয়। এ জিনিস যে হামেশাই ঘটে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' এবং তাঁর নিজের অনূদিত ইংরেজি 'Gitanjali'-যা নিয়ে বিশদভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৩ সারাংশ

একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় কোনো সাহিত্য অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসেগত নানা সমস্যার উদ্ভব হয়।

অনুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। দুটি ভিন্ন ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের মিলও পাওয়া যায় না। আবার বাংলাতে বিশেষণ বাক্যাংশ যেমন কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে বসে, তারপরে বিশেষণ বাক্যাংশ বসে। ইংরেজিতে ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরে, কখনো আগে বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। এছাড়া ছন্দগত দিক থেকেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যা দেখা যায়। উচ্চারণ রীতি অনুসারে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার ঝোঁকের একটা পার্থক্য থাকে। সেজন্য একভাষার কবিতার ছন্দকে অন্যভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়, আবার একটি কবিতাকে গদ্যে অনুবাদ করা হলে, কবিতার যে তান আছে, তাও অনুবাদে পাওয়া যায় না।

২.৪ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন :

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) ইংরেজিতে — কিছু পরে, কখনো বা আগে সাধারণত — বসে।

(খ) অনুবাদকের ক্ষেত্রে কঠিনতম সমস্যা হল —।

২. **সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :**

(ক) বিশেষণ বাক্যাংশ বাংলায় ব্যবহৃত হয় কর্তৃপদের —

(১) আগে

(২) পরে

(৩) সঙ্গে।

(খ) বাংলায় ক্রিয়াপদ বসে বাক্যের —

(১) আগে

(২) শেষে

(৩) মাঝে।

৩. অনুবাদকালে কী-কী সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. অনুবাদকালে ছন্দোগত দিক থেকে কী ধরণের সমস্যা হতে পারে, তা বর্ণনা করুন। কীভাবে তার সমাধান করা যায়, তাও দেখান।

৫. অনুবাদের সময়ে মূলের কোনো শব্দ বা চিত্রকল্পকে হুবহু ভাষান্তরিত না-করা গেলে, কী করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়?

৬. লেখক স্বয়ং অনুবাদে ব্রতী হলে কী ধরনের সমস্যা ঘটতে পারে তার আলোচনা করুন।

২.৫ অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে (২)

অনুবাদের সাফল্যের পেছনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন রসাস্বাদনের অংশীদার সাধারণ পাঠক। সচরাচর তাঁরা মূল রচনার ভাষার সঙ্গে অপরিচিত, মূল রচনার দেশ-কাল-পরিবেশ ব্যাপারে অজ্ঞ। তাঁরা অনুবাদে উপভোগ্য রস চাইবেন। তাই অনুবাদক যখন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা কোনো সাহিত্যকে অনুবাদ করতে যান, তখন যদি তিনি তার মধ্যে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে সেই অনুবাদ পাঠকের মনে রসের সংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে। এই সমস্যার সমাধানে অনুবাদককে কয়েকটি উপায় গ্রহণ করতে হয়—তা হল গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা বার্নসের "ও ফিলি" কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ থেকে এর উদাহরণ দেওয়া যায়—

"The Woodbine in the dewy wit"

"শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হাসিত"

উদাহরণটিতে "Woodbine" পরিণত হয়েছে "মল্লিকা"-য়। কারণ "মল্লিকা" নামটি বাঙালি পাঠকের অনেক কাছাকাছি। "wit"-এর বিকল্পে 'হাসিত' শব্দটি নতুন গ্রহম করা হয়েছে। এই গ্রহণে মূল অর্থকে বিঘ্নিত না করেই পরিমার্জনা করা হয়েছে।

একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রতিটি শব্দের অবস্থান, অনুক্রম, স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বন্টন, সবকিছুই একটা ঐকসুষমায় বিধৃত থাকে। যেমন একটি বিদেশি ভাষায় রচিত কবিতার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদও পরিপূর্ণভাবে মূলানুগত্য রক্ষা করতে পারে না। তখন অনুবাদকের কল্পনাশক্তি ও কাব্যচেতনা, যতটা সম্ভব শব্দের পরিমার্জনা বা নতুন শব্দ প্রয়োগের উপায়কে গ্রহণ করে। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের কল্পনাশক্তি, নতুন শব্দ প্রয়োগ মূল কবির কাছাকাছি হলে, শব্দের গ্রহণ, বর্জনের মধ্যে দিয়েও মূল কবিতার ভাব ; রূপ, রস লাভ করা যায়।

তাই পাঠক মনোরঞ্জনই সবসময় অনুবাদের মূল লক্ষ্য নয়। অনুবাদক একটি রচনা পড়ে যে-আনন্দ উপভোগ করেন, সেই আনন্দ-ই তাঁকে অনুবাদকর্মে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের মধ্যে উদ্দেশ্যের বিরোধিতা থাকে না, আবার পাঠকের সঙ্গে যেটুকু বিরোধ, তাও গৌণ হয়ে যায় এবং তখনই অনুবাদ এক নতুন শিল্প হয়ে ওঠে।

অনুবাদচর্চায় অনুবাদকের উদ্দেশ্য তাঁর অনুবাদের সার্থকতার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

১. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু, রসরিক্ত।

২. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা না থেকেও কিছু ভিন্নতা থাকলে অনুবাদে মূলানুগত্যের দিকে য- হয় কম, যদিও অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও রসের উপভোগই প্রধান হলে—অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

৩. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের একপ্রাণতা ঘটলে অনুবাদে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন দেশজ সংস্কার রক্ষা করেও যথাসম্ভব মূলানুগত্য এবং রচনার সার্বিক সৌন্দর্য রক্ষা সম্ভব হয়।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করার সময়, লেখায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের মাত্রাবিতরণ কি রকম থাকবে, সেই সমস্যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে, এখন আমরা পুরোপুরি বাংলাতেই লিখে থাকি, অর্ধেক সংস্কৃতে নয়,—সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় অনেক কমে গেছে, দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার প্রায় লোপ পেয়েছে, যতি-চিহ্নের প্রয়োগ অনেক বেড়েছে এবং শব্দব্যবহারে সংস্কৃত ও দেশজের মিশ্রণ অনেক বেড়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর মেঘদূতের অনুবাদে আধুনিক বাংলার পাশাপাশি 'অম্বু', 'অম্ভোজ'—ইত্যাদি শব্দ যা আধুনিক বাংলায় অপ্রচলিত, তাও ব্যবহার করেছেন। এছাড়া 'যুবতী-জল-কেলি-সৌরভ' ইত্যাদি দীর্ঘ সমাসও ব্যবহার করেছেন। এর পাশাপাশি 'যবে', 'পুন' ইত্যাদি কাব্যিক শব্দ, 'ললনা', 'অঙ্গনা', 'প্রমদা' ইত্যাদি প্রতিশব্দও অনুবাদে ব্যবহার করেছেন। এইভাবে খাঁটি বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা ও ভঙ্গির মিশ্রণে অনুবাদটি সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাপকভাবে সংস্কৃত শব্দ—যাদের অনেকগুলিই অপ্রচলিত—ব্যবহার করেছেন। বরং বিষ্ণু দে অনুবাদে প্রচলিত—এমনকী লৌকিক বাক্রীতি-নির্ভর শব্দও প্রয়োগ করেছেন অনেক সময়। এই সূত্রে বলি : সুধীন্দ্রনাথের 'প্রতিধ্বনি', বিষ্ণু দের 'হে বিদেশী ফুল', 'এলিয়টের কবিতা', বুদ্ধদেবের 'শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা', 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা', 'রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হুইটম্যানের কবিতা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত

সংকলন 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত', নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'Book of Bengali Verse'-ইত্যাদি বই গত কয়েক দশকের উল্লেখযোগ্য কাব্যানুবাদ সংগ্রহ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্সপিয়ারের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদচর্চার আদর্শ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তার থেকেই অনুবাদ করতে গেলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় তাদের কয়েকটি সমাধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল,—

(১) বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদচর্চা একান্তই প্রয়োজনীয়। তবে বিদেশি স্থান-কাল ও রুচিগত ঐতিহ্য—স্বদেশের স্থান-কাল ও রুচিগত ঐতিহ্যের সঙ্গো বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই অনুবাদককে দেশের পাঠকের রুচির দিকে লক্ষ্য করে অনুবাদের পরিমার্জনা, পরিবর্তন করতে হবে।

(২) মূল রচনার স্থান ও ব্যক্তিনাম অনুবাদে পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু চরিত্র, মূলভাব ও মূলকাহিনি যথাসাধ্য রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তবে স্বয়ং হেমচন্দ্রই যে, রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনিতে কলকাতার গড়ের মাঠের উল্লেখ করেছেন, তেমন রূপান্তরণ আদৌ বাঞ্ছিত নয়।

(৩) যথাযথ অনুবাদের জন্য, অনুবাদকে উন্নত করার জন্য অনুবাদক স্থানে-স্থানে নিজস্ব কল্পনার আশ্রয়ও নিতে পারেন।

অনুবাদের সময় অনুবাদক ও রচনাকারের মধ্যে যখন প্রকাশ ভাবনার ক্ষেত্রে বিরোধ থাকে না, তখনই সার্থক অনুবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার প্রভাব অনুবাদকের মনকে যেমন উদ্দীপ্ত করে, তেমনি সমকালীন পাঠকের সাহিত্য-মানসেও তার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। সমকালীন পাঠকের দাবী ও সংস্কারের সঙ্গো অনুবাদকের সম্ভাব্য বিরোধগুলি যথাসম্ভব অতিক্রান্ত হলে—অনুবাদকের ভাব ও রূপের আস্বাদন সমকালীন পাঠকের কাছে নতুন এক সাহিত্য ঐতিহ্য হিসেবে প্রতীত হয়ে ওঠে। সূক্ষ্মতরভাবে এই প্রভাব সঞ্চারিত হয় সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে, যাঁরা নতুন ভাবস্পন্দন ও রসের সন্ধান করেন। অনূদিত সাহিত্য অনুবাদের ভাষার সাধারণ অনুষঙ্গ ও ধ্বনিতরঙ্গোর মধ্যে অন্বিত হলে উন্মেষশীল সাহিত্য নির্মাতাদের প্রভাবিত করে ; সাহিত্যে নতুন ভাব ও আঙ্গিক নির্মাণে, শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা, তাঁদের সাহিত্য চেতনায় এনে দেয়। সামগ্রিকভাবে এক নতুন ভাব-ঐশ্বর্য সেই ভাষার সাহিত্যে সংযোজিত হয়।

অনুবাদের বৃহত্তর সার্থকতা এই যে, তা সার্বিকভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, এক নতুন সৌন্দর্যের জগৎ সেই ভাষাভাষী পাঠকের চেতনায় সঞ্চারিত হয়। যে-রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়েনি, সার্থক অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তার অভিনব আবির্ভাব আমাদের নান্দনিক-চৈতন্যকে পরিপূর্ণভাবে ঋদ্ধিমান করে তোলে।

২.৬ সারাংশ

সাধারণ পাঠকরাই একটি অনুবাদের সাফল্যের বিচার করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তাই অনুবাদক যদি অনুবাদে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে তা পাঠকের রসসংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। তখন অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে, এজন্য অনুবাদকালে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা করতে হয়।

তবে সবসময় শুধু পাঠকই কোনো অনুবাদের মূল লক্ষ্য নন। অনুবাদক একটি রচনা পাঠ করে যে-আনন্দ উপলব্ধি করেন, তাই তাঁকে অনুবাদ করতে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকে না এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। কারণ মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু।

তবে আদর্শ অনুবাদের সার্থকতা এই যে, তা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের নান্দনিক চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

২.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) অনুবাদের সাফল্যের পেছনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন রসাস্বাদনের অংশীদার সাধারণ—।

(খ) অনুবাদের সময় অনুবাদক ও — মধ্যে যখন বিরোধ থাকে না, তখন—নবসৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. **সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :**

(ক) সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় —

(১) কমেছে

(২) বেড়েছে

(৩) একইরকম আছে

(খ) শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ করেছেন—

(১) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩) বুদ্ধদেব বসু

৩. অনুবাদকালে সঞ্জাত সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৪. অনুবাদ কীভাবে এক নতুন ধরনের শিল্প হয়ে উঠতে পারে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

২.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১. (ক) কর্তার, ক্রিয়াপদ।

(খ) শিল্পরূপায়ণের।

২. (ক) আগে

(খ) শেষে

৩ এবং ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

৫ এবং ৬ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য '২, ৩' অংশের শেষ দিকের অনুচ্ছেদগুলি ভালভাবে পড়ুন।

অনুশীলনী ২

১. (ক) পাঠক।

(খ) রচনাকারের, অনুবাদের।

২. (ক) কমেছে।

(খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ এবং ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অনুবাদচর্চা (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪ খণ্ড) ;

২. কালিসাধন মুখোপাধ্যায় - পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ ;

৩. বুদ্ধদেব বসু - কালিদাসের মেঘদূত ;

৪. পল্লব সেনগুপ্ত - অনুবাদের ভাষা : কবিতার অনুবাদ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ৭ম-৮ম সংখ্যা, ১৯৯০) ;

৫. মঞ্জুভাষ মিত্র - আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব।

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পি. জি. বি. - ৮
বাংলা বিষয়ের
স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায়
(২)

বিষয়সূচি

একক ১ ❐	অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা, বিকাশধারা এবং প্রকরণ প্রণালী	৩৯
একক ২ ❐	অনুবাদের সমস্যা এবং সমাধান	৫৭

একক ১ ❒ অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা, বিকাশধারা এবং প্রকরণ প্রণালী

১.১ প্রস্তাবনা
১.২ অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা
১.৩ সারাংশ
১.৪ অনুশীলনী
১.৫ অনুবাদচর্চার বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী
১.৬ সারাংশ
১.৭ অনুশীলনী
১.৮ উত্তরমালা
১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

১.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি মূল দুটি ভাগে বিভক্ত। এককটির প্রথম অংশে ১৮ শতাব্দীর জার্মান মনীষী ইয়োহান গটফ্রিড হার্ডারের বিশ্বসংস্কৃতির ধারণার কথা বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি জার্মানিরই মহাকবি ভলঅফগ্যাঙ গ্যেটে কেন পারস্পরিক ভাবে সাহিত্যের সৃজন-সম্ভার বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য, অনুবাদই সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা, একথা উল্লেখ করে—কেন যুগে যুগে অনুবাদচর্চার প্রয়োজন ঘটেছে, সেকথাও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখিত। সংস্কৃতভাষায় লেখা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ কেন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি, অনুবাদের বিভিন্ন প্রকার-প্রকরণ নিয়েও এখানে বিস্তৃতভাবে তথ্যবিচার ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

আপনি যদি এই এককটি ভালো করে পড়েন, তাহলে আপনি অনুবাদচর্চার কারণ এবং বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আলোচনা করতে পারবেন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে কোনো অসুবিধাই হবে না। ভালো করে এককটি পাঠ করে অনুশীলনী দুটির উত্তর

দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

১.২ অনুবাদচর্চার প্রয়োজনীয়তা

বিখ্যাত জার্মান কবি-দার্শনিক গেটের এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু হার্ডারই সর্বপ্রথম 'বিশ্বসংস্কৃতি' নামে এক ধারণার কথা বলেন। একটি বিশেষ দেশের সংস্কৃতি যদি রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা অন্য কোনো কারণে অন্যদেশে ছড়াতে না পারে, বা অন্যদেশের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য গুণগুলিকে আত্মগত করতে না পারে, তাহলে সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সেই সংস্কৃতির প্রাণশক্তি অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যদি বিনিময় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে তার সমৃদ্ধি এবং বিকাশ রুদ্ধ হতে বাধ্য। এই বিনিময়ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া হবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই টেও মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক দেশেরই আলাদাভাবে জাতীয় সংস্কৃতি বলে একটা বিশেষ চরিত্র আছে। সেই পৃথক চরিত্রকে মেনে নিয়েই সেইসব আলাদা আলাদা সংস্কৃতির মিলগুলিকে খুঁজে নিয়ে কাছাকাছি আনতে হবে এবং তাদের ভিতরকার গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায়, পারস্পরিকভাবে বিনিময় করতে হবে। কাজেই একটি বিশেষ ভাষার লেখকের কাজ হবে তাঁর নিজের ভাষার ভাবনাচিন্তা এবং প্রকাশভঙ্গির যেসব বৈশিষ্ট্য তাঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকে অন্যদেশের লেখক ও পাঠকদের সামনে মেলে ধরা. যদি কোনো ভাষা সাহিত্যিক ঐতিহ্যে, সৃষ্টিকর্মে, দক্ষতায় অন্যদেশের তুলনায় কম সমৃদ্ধ হয় তাহলে সেই দেশের সাহিত্য অন্যান্য সব সমৃদ্ধ দেশের সাহিত্যের লেখক একটি ব্যাপক প্রেক্ষাপটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিজেদের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং সেই বিনিময়ের সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হতে পারি। ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবোধ জাগরূক করার জন্য ও ব্যাপক ও সুষ্ঠু অনুবাদকর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও যে আছে, সে কথাও এখানে একান্তভাবেই স্মরণযোগ্য।

তবে একটি কোনো সাহিত্যের এলাকাভুক্ত লেখকের পক্ষে বহুদেশের সাহিত্য আয়ত্ত করা কখনোই সম্ভব নয়। কেননা বহুদেশের সাহিত্য আয়ত্ত করতে গেলে বহুভাষাবিদ্ হতে হবে। সাধারণভাবে, প্রত্যেকটি সাহিত্য পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়েই দু-চারজনই থাকেন যাঁরা একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। সেইজন্যই গ্যেটে পারস্পরিক ভাবনার বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাহিত্যের অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি এটা ভালোভাবেই জানতেন যে, যে-কোনো সাহিত্যেই 'ভালো' অনুবাদ দুর্লভ। (এখানে প্রচলিত একটি ইতালীয় প্রবচন স্মরণীয় "অনুবাদ যদি সুন্দরী হয়, তাহলে তাকে অবিশ্বস্তা হতেই হবে এবং বিশ্বাসভাজন হলে, কুদর্শনা হতেই হবে তাকে!") কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনুবাদ আমাদের করতে হবে এবং অনুবাদের মাধ্যমে যে-সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। কেননা, প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তার প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের মধ্যেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গির সক্রিয়তা থাকে, সেগুলিকে অন্যদেশের ভাষায় অনুবাদ করা খুবই সমস্যার ব্যাপার।

কিছু আগেই বলেছি যে, দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের যে কয়েকটি উপায় আমাদের জানা আছে, তার

মধ্যে অনুবাদ একদিক থেকে সবচেয়ে কার্যকরী। লেখক এবং তাঁর ভাষা যখন প্রাচীন, তখন তাঁকে সমকালীন জীবনের মধ্যে সংকলিত করার কাজও এক অর্থে অনুবাদকেরই দায়িত্ব বলে স্বীকার্য, অনুবাদই সেই ঘটক, যার প্রণোদনার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন সাহিত্য একটা বৃহদায়তন স্থাবর সম্পত্তি নয়, যুগে-যুগে তা জঙ্গাম হয়ে ভাব-বাণিজ্যের যোগ্য বলেই আমরা তাকে 'ক্লাসিক' বা ধ্রুপদী নাম দিয়েছি এবং আমাদের আজকের দিনের সম্পূর্ণ এই ভিন্ন পরিবেশেও তার সংলগ্নতা বা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অনুবাদ সেই প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ করে তোলে। আর সেইজন্যই যুগে-যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়। যেহেতু ভাষাই সাহিত্যের বাহন, তাই কোনো একটি অনুবাদ চিরকাল ধরে পর্যাপ্ত বলে গণ্য থাকে না, প্রত্যেকটি যুগ তার সমকালীন ভাষার যে বিশেষ ভঙ্গির এবং ভাবনার যে বিশিষ্ট চরিত্রের জন্ম দেয়, তার মধ্যে দিয়েই পুরোনো অনুবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাগুলিতে গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যের প্রচুরায়ত অনুবাদ প্রতি যুগেই হয়ে আসছে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই ঘটেছে।

আবার অন্যভাবে দেখলে এটাই বলতে হয় যে, অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই অন্যভাষার মূল রচনা পড়া সম্ভবপর হয় না বলে অনুবাদের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় এক-একটি অনুবাদ এক-একটি দেশ বা মহাদেশের সাহিত্যের ধারা বদ্‌লে দিয়েছে, এমনকি যাঁরা মূল রচনার সঙ্গো পরিচিত, তাঁরাও অনেক সময়েই ভালো অনুবাদ পড়ে লাভবানই হন—কারণ ভালো অনুবাদ শুধুমাত্র মূল রচনার প্রতিনিধিত্বই করে না, তার যুগ ও অনুবাদকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাদও পাঠককে উপলব্ধি করায়। এখানে একটা তাত্ত্বিক প্রশ্নও অবশ্য ওঠে "গুড ট্র্যানস্লেশ্যন ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন" (ভালো অনুবাদ বস্তুতপক্ষে নতুন একটি রূপসৃষ্টিই) এই তত্ত্বগত অবস্থানটিকেও মেনে নিতে হয় সুসাহিত্যপাঠের খাতিরে। এই 'নতুন রূপসৃষ্টি' বা 'ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন' কিন্তু নির্বাধন স্বাধীনতার ছাড়পত্র দেয় না ; মূল সৃষ্টির ভাব সৌন্দর্যকে অনাহত রেখেই কিন্তু যে-সংস্কৃতি বলয়ের ভাষায় তার 'অনুবাদ'-তথা-'নতুন রূপায়ণ' করা হয়েছে, তার শৈলী ও রুচি মর্জিকে সেখানে সংলগ্ন করতে হবে। আন্তন চেখভের নাটক 'চেরি অর্চার্ড'-কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী'-তে যেভাবে রূপায়িত করেছেন, সেটি ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন-এর একটি ভালো নিদর্শন।

১.৩ সারাংশ

এই আলোচনার শুরুতেই, বিশ্বসংস্কৃতির ধারণার কথা হার্ডার-ই যে সর্বপ্রথম বলেন সে কথার উল্লেখ করেছি। এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়াতে ব্যর্থ হলে এবং অন্যদেশের সংস্কৃতির রস নিজের মধ্যে আহরণ না করতে পারলে, সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, একটি সংস্কৃতির আয়ত্তে অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গো বিনিময় করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক বিনিময় হবে। তবে বিনিময় করার সময় প্রত্যেক দেশের জাতীয় সংস্কৃতি নামক পৃথক চরিত্রকে বজায় রাখা প্রয়োজন। এইভাবে পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে এতটি ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হতে পারে, তেমনি একজন সাহিত্যিকও নিজের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং এভাবে সকলেই আমরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে

পারি।

একজন সাহিত্যিকের পক্ষে যেমন বিভিন্ন ভাষা জানা সম্ভব নয়, তেমনি একজন মাত্র পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। তাই পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে গ্যেটে অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য অনুবাদ-ই সবচেয়ে কার্যকরী। প্রাচীন সাহিত্য যাকে আমরা 'ক্লাসিক' (ধ্রুপদী) নাম দিয়েছি, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেই প্রাচীন সাহিত্য সমকালীন সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। আর সেই কারণেই যুগে যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়।

১.৪ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১. অনুবাদচর্চার প্রয়োজন কেন, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

২. গ্যেটে পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুবাদের আশ্রয় কেন নিতে চেয়েছিলেন, তা লিখুন।

৩. ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশে অনুবাদচর্চার গুরুত্ব বেশি কেন, সেটি বুঝিয়ে বলুন।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) প্রত্যেক দেশেরই আলাদা ভাবে—বলে একটা বিশেষ চরিত্র আছে।

(খ) —পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে—আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন।

১.৫ অনুবাদ-চর্চার বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী

উনিশ শতকের বাংলাদেশের ভাবজীবনে যে-অভিনব চিন্তাতরঙ্গের আলোড়ন দেখা গিয়েছিল তা সাধারণভাবে রেনেসাঁস বা নবচেতনা নামে চিহ্নিত। ইংরেজ-অধিকার এই দেশের গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করল এবং তার ফলে পল্লীসংস্কৃতি শুকিয়ে গেল। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনের সহায়ক হল নতুন গড়ে ওঠা একটি ধনবান ও একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের (মূলত, ইংলন্ডেরই) সংস্কৃতি ছিল তাদের কাছে অনুকরণীয়, এর পাশাপাশি তারা বিজয়ী শাসকশ্রেণীর ব্যবহারিক সংস্কৃতিকেও অনুসরণ করতে থাকল। কাজেই দেখা গেল নবচেতনার কালে প্রাচীন সংস্কৃতির অবক্ষয়, ভাঙনের মধ্যে শূন্যস্থান পূরণের জন্য শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতিকে দুর্বলভাবে অনুসরণ (বা অনুকরণ) করাই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই অনুকরণের যা-যা উপজীব্য ছিল, তাদের মধ্যে আধুনিক যুগের বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শও দেখা যায়। অন্যভাবেও এই অনুকৃত সাহিত্য-সংস্কৃতির তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিৎকে নাড়িয়ে দিল, তেমনি আবার সেই ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নতুন বিরোধের বীজও লক্ষ করা গেল। যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল, তারাই আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অস্ত্র

হিসাবে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিল। একারণে বিজয়ী সংস্কৃতির আদর্শ গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এইসময় সেকালের উন্নত ও প্রগতিশীল মনীষীরা, যেমন রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রমুখ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চেয়েছিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কৃষ্টি-কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিরও সুপ্রতিষ্ঠ অবস্থানও তাঁদের বিশেষভাবে অভীপ্সিত ছিল। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আন্দোলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুসরণ দেখা দিয়েছিল আর পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুপ্রেরণায় তৈরি হওয়া নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সাহায্যে বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবরূপের অনুপ্রেরণায় নতুন একটি সাহিত্যধারা গড়ে উঠল। আর তারই অনুষঙ্গে অনুবাদেরও ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দিল। আধুনিক যুগেও বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা গভীরভাবে পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে যেভাবে অধ্যয়ন করে চলেছেন তা তাঁদের মৌলিক রচনায় যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদচর্চাতেও তা প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর মূলত ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হল। এই সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নে অনুবাদই প্রধান অবলম্বন ছিল। সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকেই অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা শুরু হয় এই সময় থেকে।

১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরী রচিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত'—'গস্‌পেল অব সেন্ট ম্যাথু'—ইংরেজি থেকে বাংলায় প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। এরপরে ১৮০৩-তে 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' নামে ঈশপের গল্প কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় রচিত হয়। বাংলা অনুবাদটি করেছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। ফোর্ট উইলিয়মের অন্যতম সেনানী সি. মংকটন ১৮০৯ সালে শেক্সপিয়রের 'দ্য টেম্পেস্ট' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র জে. সার্জেন্ট প্রথম বাংলায় পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্য অনুবাদ করেছিলেন। ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যের প্রথম সর্গ তিনি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদ করেন। এরপরে গিরিশচন্দ্র বসু ''ইলিয়াড"-এর প্রথম সর্গ এবং মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট'-এর অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হোমারের কাব্য 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' নামে অনুবাদ করেন। এই সময় হরিমোহন গুপ্ত পার্নেলের 'দ্য হার্মিট' কাব্যের অনুবাদ করেন। অনুবাদটির নাম 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান'। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় গোল্ডস্মিথ-এর 'ডেজার্টেড ভিলেজ'-এর অনুবাদ করেন 'পরিত্যক্ত গ্রাম' নামে। টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' কবিতার অনুবাদ—করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী এই নামে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭৫-তে ওয়াল্টার স্কটের 'দ্য ল্যে অব দ্য লাস্ট মিনস্ট্রেল'-এর অনুবাদ করেন রাখালদাস সেনগুপ্ত 'শেষ বন্দীর গান নাম' দিয়ে।

এরই পাশাপাশি আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই গদ্য, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটক রচনাতেও অনুবাদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অনুবাদমূলক। ১৮৭৬ সালে জোনাথন সুইফটের-এর 'গালিভার'স ট্রাভেল্‌স'-এর 'অপূর্ব দেশভ্রমণ' নাম দিয়ে উপেন্দ্রনাথ মিত্র অনুবাদ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'অদ্ভুত দিগ্বিজয়'

(প্রথম খণ্ড)' নাম দিয়ে বিখ্যাত স্পেনীয় লেখক সার্ভেন্তিসের 'দোন কীহোতে' (ডন কুইক্‌জোট) এবং 'মন্মথ মনোরমা' (প্রথম খণ্ড) নাম দিয়ে হেনরি ফিলডিঙের 'আমেলিয়া'—এই গ্রন্থদুটির অনুবাদ করেন বিপিনবিহারী চক্রবর্তী। সেকালের ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় রেনল্‌ডসের 'মিস্ট্রিজ অব দ্য কোর্ট অব লন্ডন'-এর কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে কথাসাহিত্যের অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তিনি ফরাসি বাষা থেকে বার্নাদ্যাঁ দ্য সাঁ পিয়ের-এর 'পোল এৎ ভির্জিনি'-র 'পৌলবর্জিনী' নামে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদের কথা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ছোটগল্প প্রথম চৌধুরীর 'ফুলজানি' ফরাসি লেখক প্রস্পার মেরিমির গল্প থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বিলিতি নাটকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভাবানুবাদ করেন হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ও ভেনিস'-এর ভাবানুবাদ করেন তিনি 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাম দিয়ে। ১৮৬৪-তে তিনি আবার শেক্সপিয়রের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' তাঁর হাতে পরিণত হয় 'চারুমুখ চিত্তহরা'-তে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি হোমারের 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যের আংশিক অনুবাদ করেন 'হেক্টর বধ' (১৮৭১) নামে। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে অনুবাদের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেক্সপিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের অনুবাদ করেন 'নলিনী বসন্ত' নাম দিয়ে। এরপরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিনি শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের অনুসরণে 'রোমিও জুলিয়েত' নাটক রচনা করেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি ইংরেজি কবিতাও অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—লংফেলোর রচিত 'সাম্ অব লাইফ'-এর অনুবাদ 'জীবন সঙ্গীত', আলেকজান্ডার পোপের 'এলয়সা টু আবেলার্ড'-এর প্রেরণায় 'মদন পারিজাত', শেলির 'দ্য স্কাইলার্ক'-এর অনুসরণে 'ভরতপক্ষীর প্রতি' (চাতকপক্ষীর প্রতি) ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। 'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি পুরো মূলানুগ, তবে 'মদন পারিজাত'-এ স্থানে স্থানে মূলানুগত্য লক্ষ করা যায়। 'ভরতপক্ষীর প্রতি', যা পরে হয়েছিল 'চাতকপক্ষীর প্রতি' কবিতাটিতে কবি মূল রচনাকে প্রায় পুরোপুরি-ই অনুবাদ করতে চেয়েছেন।

হেমচন্দ্রের পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র সেন শেক্সপিয়রের 'এ মিড সামার নাইট'স ড্রিম'-এর মর্মানুবাদ করেছিলেন। আরো পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত কিছু অনুবাদ করেছিলেন। যেমন-তাঁর 'গেছে' কবিতাটি ব্রাউনিঙ-এর একটি কবিতার আংশিক ভাবানুবাদ :

"এই পথ দিয়ে গেছে—এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ ফুলে চরণ—অলখিত রেখা ;
এই পথ দিয়ে গেছে ছিঁড়ে পাতা তুলে ফুল ;"

"This path so soft to pace shall lead
Thro' the magic of May to herself indeed?"

এরপরে আমরা চলে আসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদচর্চার প্রসঙ্গে। পাশ্চাত্যের বহু কবিতার অনুবাদ তিনি করেছিলেন। দীর্ঘ আট বছর ধরে তাঁর এই অনুবাদচর্চা প্রসারিত ছিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র

ভট্টাচার্যের অনুরোধে কবি 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেন। তবে সেটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ইচ্ছামতো কবি এখানে শব্দের পরিবর্তন করেছেন। যেমন— "The rumpfed ronyon cries"-এর বাংলা করা হয়েছে "পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে"। তবে ডাইনিদের সংলাপের মূল ভাব অনুবাদের ভাষায় আশ্চর্য রকমভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এর পাশাপাশি তিনি ম্যুর, বায়রন, বার্নস প্রভৃতি কবির বিভিন্ন কবিতা অনুবাদ করেছেন। যেমন—'বিচ্ছেদ' কবিতাটি ম্যুরের 'As Slow Our Ship'-এর অনুবাদ। 'বিদায় চুম্বন' কবিতাটি বার্নসের 'As Fond Kiss' কবিতার অনুবাদ। বার্নসের 'O philly, Happy be that day' কবিতার অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন 'ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)'।

অনুবাদচর্চায় রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুবাদ প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (১ম) প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল। তাঁর অনুবাদের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল ইংরেজি সাহিত্য আস্বাদন এবং শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যরস পৌঁছে দেওয়া।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—শেলি, কীটস্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইনবার্ন, ব্রাউনিং, এডগার অ্যালান প্যো, ওয়ালট হুইটম্যান প্রমুখ পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকদের লেখার পাশাপাশি, সংস্কৃত, ফরাসি, চিনা, জাপানি, তামিল ইত্যাদি ভাষা থেকে এবং ডিরোজিও, তরু দত্ত-প্রমুখ এদেশি ইংরেজি কবিদের লেখারও কিছু অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি অনুবাদ সংকলন হল : 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' এবং 'মণিমঞ্জুষা'।

এতক্ষণ আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এবার আসি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে। উনিশ শতক নবজাগরণের যুগ। এযুগে শিক্ষিত বাঙালিরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বিদেশি ভাবধারাকে গ্রহণের পাশাপাশি নিজের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের গরিমা আবিষ্কারও করতে চেয়েছেন এবং এর ফলেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদচর্চা শুরু হয়েছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শাখা। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদির বঙ্গানুবাদকে প্রাচীন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে কিছু কারণ উল্লেখিত হয়ে থাকে। প্রথমত, তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখা যায়, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপিত করার জন্য সংস্কৃত থেকে মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হল। সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ধর্মের উপর রাজশক্তির আক্রমণে, একসময় ব্রাহ্মণ্য বিধিশাসিত হিন্দুসমাজ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণজনিত উত্তালতা কিছুটা শান্তরূপ ধারণ করলে সমাজে আবার শিল্প-সংস্কৃতির জোয়ার এলো। অনুবাদ-সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থগুলি, তুর্কি বিজয়ের প্রথম দু-শতকের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার অবসানের পরে এবং চৈতন্য-প্রভাব বিস্তারিত হবার আগে রচিত হয়েছিল। তুর্কি-বিজয়ের ফলে পরাজিত হিন্দুশক্তি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। এই প্রতিরোধের মূল কথা ছিল উপরতলার ব্রাহ্মণ্য-বৈদিক-স্মার্ত-পৌরাণিক ধারার সঙ্গে লোকজীবনে প্রচলিত অব্রাহ্মণ্য-অবৈদিক-অস্মার্ত-অপৌরাণিক ধারার মিশ্রণ। এই মিশ্রণের ফলে যে নতুন ভাবধারা গড়ে উঠেছিল, তার সামনে পৌরাণিক আদর্শ তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের

উত্তরাধিকারী। তাই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ। হিন্দু সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যেই নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পৌরাণিক সাহিত্য—বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের প্রচারের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত যা কিনা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল তা জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে একদম জড়িয়ে যাবার সুযোগ পেল।

দ্বিতীয়ত, গৌড়ের সুলতানেরা সিংহাসনে সুস্থির হয়ে রাজসভার পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার যখন আগ্রহ দেখান, তখন থেকেই এসব গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতার-তুরকি-খোরাসানি-পাঠান-মুসলমানরা প্রথম দিকে দূরত্ব বজায় রেখে এদেশকে শাসন করলেও ধীরে ধীরে তাঁরা এদেশকে ভালোবেসে, এদেশের ভাষা শিখে, এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অনেক সুলতান-ই হিন্দু পণ্ডিতদের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতে চাইতেন এবং অনেক সময় তাঁরা সেগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতেও উদ্বুদ্ধ করতেন। বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাসকার ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছিলেন, "মুসলমান, ইরান, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল। গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।" মালাধর বসু তাঁর গ্রন্থে সুলতান বারবক শাহের কথা বলেছেন। আবার কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী ছুটি খাঁর সভাকবি ছিলেন। অবশ্য এঁরা দুজনেই মুসলমান সুলতানের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ আনুকূল্য পেয়েছিলেন। এই সমস্ত মুসলমান নৃপতিরা মহাভারতের কাহিনীর প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের এই যুগকে হুসেনশাহী যুগ নামে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয়ত, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনি কবিদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা এগুলি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে শুধু সুলতান বা নৃপতিদের আনুকূল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কাব্য রচনা করেছিলেন তা নয়, কাব্যগুলির সাহিত্যগুণে মুগ্ধ হয়েও সেগুলি অনুবাদে আগ্রহী হয়েছিলেন।

প্রথমযুগে রচিত এইসব অনূদিত গ্রন্থের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—সেই সময় বাঙালি কবিদের সামনে কালিদাসের বিখ্যাত সব কাব্য, নানারকম পুরাণ ইত্যাদি থাকলেও, তাঁরা প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থগুলির অনুবাদই বেশি করেছেন। কারণ কাব্যসৌন্দর্য অপেক্ষা ধর্মীয় মাহাত্ম্যের দিকেই তাঁরা বেশি আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালেও অনুবাদের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ করা যায়।

প্রথম যুগের অনুবাদকরা অনুবাদ করার সময় মৌলিক চিন্তা অপেক্ষা, মূল গ্রন্থের যে অনুসরণ করতে চাইবেন, তা ছিল স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তাই। কৃত্তিবাস ছাড়া অন্য কবিরা, যেমন—মালাধর বসু, শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রমুখ মোটামুটি ভাবে মূল গ্রন্থকেই অনুসরণ করেছেন। তবে মালাধর বসু মূল

ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেছিলেন।

তবে বাংলাভাষায় সংস্কৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এর ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধিশালিনীও হয়েছে এবং বাংলা ভাষার সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় কয়েকটি উপনিষদ্ ও বেদান্তের অনুবাদ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী করেছিলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ। নবীনচন্দ্র দাস রঘুবংশের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। এর পাশাপাশি কালিদাসের প্রতিটি কাব্যের অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া পাণিনির ব্যাকরণ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অমরকোষ, সাহিত্যদর্পণ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থও অনুবাদ হয়েছে। -ত্ত

ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি পালি ও প্রাকৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা ভাষায় হয়েছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কল্পসূত্র, জগৎরাম ভট্টাচার্যের দশবৈকালিক সূত্র, রাধাগোবিন্দ বসাকের গাথাসপ্তশতীর অনুবাদ সর্বজনবিদিত। ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতকের অনুবাদ তো বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

❒

এতক্ষণ আমরা ইংরেজি ও সংস্কৃত অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশধারা নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসি অনুবাদের প্রকার পদ্ধতি নিয়ে। অনুবাদের পদ্ধতি অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন : আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, আংশিক অনুবাদ, বিকৃত অনুবাদ, কবিতার অনুবাদ ইত্যাদি। এখানে আমাদের আলোচ্য আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ এবং কবিতার অনুবাদ ঃ

(১) আক্ষরিক অনুবাদ : যে-সমস্ত অনুবাদে মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়, তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বা মূলানুবাদ বলে। আক্ষরিক অনুবাদে শব্দ ও তার নিজস্ব প্রয়োগগত অর্থ বজায় রেখে তার দ্বারা ভাষান্তরে শব্দের নির্মাণ ঘটায়। প্রাচীন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি খুব একটা গৃহীত হয়নি। ইংরেজি থেকে বাংলায় করা কিছু অনুবাদে আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'I saw in Luisiana a live oak growing' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪১, বৈশাখ সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'-তে 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। এখানে প্রথমে মূল ইংরেজি কবিতাটি উল্লেখ করে, রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদটি দেওয়া হল।

"I saw in Luisiana a live oak growing,
All alone stood it and the moss hung down from the branches.
Without any companion it grew there uttering joyous leaves of dark green,
And its look, rude, unbending, lusty, made methink of myself,
But, I wonder'd how it could utter joyous leaves standing.
Alone there without its friend near, for I knew I could not.

And took off a twig with a certain number of leaves upon
It, and twined around it a little moss.
And brought it away, and I have placed it in sight in my room,
It is not needed to remind me as of my own dear friends.
(For I believe lately I think of little else than of them)
Yet it remains to me a curious token, it makes me think of manly love,
For all that, and though the oak glistens there in
Luisiana solitary in a wide flat space,
Uttering joyous leaves all its life without a friend a lover near,
I know very well I could not."

"লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠেছে
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোন দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন করে এ গাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে ভরা আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর
আমি বেশ জানি আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলাম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ওই বন্ধুদের ছাড়া আর কোন কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝলমল করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে চিরজীবন ধরে,
তবু আমার মনে হয়, আমি তো পারতুম না।"

অনুবাদটি সম্পূর্ণ মূলানুগ। এমন মূলানুগ অথচ কাব্যরসান্বিত অনুবাদ খুব কম পাওয়া যায়। অনুবাদে কবি মূলের প্রায় প্রতিটি শব্দেরই যথার্থ রক্ষা করেছেন। এমনকি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ যে সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তা-ও মূল ভাবের অনুসারী। যেমন—

"....uttering joyous leaves of dark green."—

পংক্তিটির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"...ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।"—

এই অনুবাদ একই সঙ্গো স্বচ্ছন্দ এবং কঠিন মূলানুগত্যের বাঁধনে বাঁধা।...হয়ত কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এমন সুন্দর ও মূলানুগত অনুবাদ করা সম্ভব—যা সেই পূর্বোল্লিখিত ইতালীয় প্রবচনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে!

(২) **ভাবানুবাদ** : এতে মূলের অবিকল অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে বক্তব্যের ভাব বজায় রেখে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে তা পরিবেশন করা হয়। এমনকি এখানে ভাষা সম্পর্কেও অনুসরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের যে বিশাল অনুবাদ সম্ভার এদেশে গড়ে উঠেছিল তাতে ভাবানুবাদ-ই বেশি পাওয়া যায়। তবে এইসব গ্রন্থে কবিরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে অনুসরণ করলেও, অনেক সময় নিজের ইচ্ছামতোও কাহিনিকে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে কৃত অনুবাদের সময়ে ভাবানুবাদেরই আধিক্য লক্ষ করা যায়। এখানে বার্নসের "O Philly, happy be that day" কবিতা এবং তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)" কবিতা মিলিয়ে দেখা যায় :

"HE O Philly, happy be that day
When roving through the gather'd hay
My youthful heart was stown away
And by thy charms my philly.

SHE O Willy, aye I bless the grove
Where first I own'd my maiden love,
Whilst thou didst pledge the powers above
To be my ain dear Willy.

HE As songsters of the early year
Are ilka day mair sweet to hear,
So ilka day to mair dear,
And charming is my Philly.

SHE As on the brier the budding rose
Still richer breathes and fairer blows

So in my tender bosom grows
The love I bear my Willy.

HE The milder sun and bluer sky
That crown my harvest cares wi'joy
Were ne'er so welcome to my eye
As is a sight of Philly.

SHE The little swallow's want on wing,
Though wafting o'er the flowery spring
Did ne'er to me sic tidings bring
As meeting O' my Willy.

HE The bee that through the sunny hour
Sips nectar in the opening flower,
Compared wi' my delight is poor
Upon the lips of Philly.

SHE The woodbine in the dewy weet,
When evening shades in silence meet,
Is nocht sae fragranter say sweet
As is a kiss O' Willy,

HE Let fortune's wheel at random rin,
And fools may tyne, and knaves may win
My thoughts are a' bound up in one,
And that's my ain dear Philly.

SHE What's a' the joys tha gowd can gie?
I care na wealth a single flie;
The lad I love's the lad for me
And that's my ain dear Willy."

"ললিত। হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন,
দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন!
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন!

নলিনী। কত ভালোবাসি সেই বনেরে ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা লয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।

ললিত। বসন্ত-বিহগ যথা সুললিত ভাষী
যত শুনি তত তার ভালে লাগে গীতধার
যতদিন যায় তত তোরে ভালোবাসি
যতদিন যায় তব বাড়ে রূপরাশি।

নলিনী। কোমল গোলাপ কলি থাকে যথা গাছে
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত
এ হৃদয় ভালোবাসা আলো করে আছে
সঁপেছি সে ভালোবাসা তোমারিগো কাছে।

ললিত। মৃদুতর রবিকর সুনীল আকাশ
হেরিলে শস্যের আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।

নলিনী। মধু আগমনে বার্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত
মিলিলে তোমারি সাথে প্রাণের ললিত।

ললিত। কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয়ভরে, হরষে চুম্বন করে
সে কি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধরখানি করি গো চুম্বন ?

নলিনী। শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হাসিত
বিজন সন্ধ্যার বায়ে ফুটে সে মলয়বায়ে
সে এমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।

ললিত। ঘুরুক অদৃষ্টচক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক রসাতলে কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানি ওগো প্রিয়া।

নলিনী। ধন র- কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয়ধনের আমি দরিদ্র ভিখারি
সে প্রণয়, ললিত গো তোমারি তোমারি।"

এটি মূল কবিতার মোটামুটি ভাবানুবাদ হয়েছে। মূল কবিতার 'He' এবং 'She' অনুবাদে 'ললিত' ও 'নলিনী' হয়েছে। অনুবাদে মূলের স্তবক রক্ষিত হয়েছে। এমনকি মূল কবিতার ছন্দস্পন্দনও অনুবাদে ধরা পড়েছে। শেষ স্তবকেও প্রথম দু'চরণের ভাবানুবাদ হয়েছে।

(৩) কবিতার অনুবাদ :

কবিতার অনুবাদ যেমন আক্ষরিক হতে পারে, তেমনি ভাবানুবাদও হতে পারে। এখানে বার্নসের 'Ae Fond Kiss' কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের অনূদিত 'বিদায় চুম্বন' কবিতাটি দেওয়া হল।

"Ae fond kiss, and then we sever;
Ae farewel and then, forever!
Deep in heart, wrung tears, I'll pledge thee
Warring sighs and groans I'll wage thee

Who shall say that fortune grieves him.
While the star of hope she leaves him?
Me, nae cheerful twinkle lights me;
Dark despair around be nights me.
I'll ne'er blame my partial fancy,
Nae thing could resist my nancy;
But to see her and love for ever.
Had we never loved but kindly,
Had we never loved sae blindly,
Never met or never parted,
We have never been broken hearted
Fare thee well, thou first and fairest!
Fare thee well, thou best and dearest!
Thine be like joy and treasure.
Peace, enjoyment, Love and Pleasure!
Ae fond kiss and then we rever."

"একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
জনমের মতো দেখা হবে নাকো আর
মর্মভেদী অশ্রু নিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
দুখের নিশ্বাস আমি দিব উপহার।
সেতো তবু আছে ভালো,   একটু আশার আলো
জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার,
কিন্তু মোর আশা নাই   যে দিকে ফিরিয়া চাই
সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।
ভালো যে বেসেছি তারে দোষ কী আমার?
উপায় কী আছে বল উপায় কী তার?
দেখামাত্র সেই জনে   ভালোবাসা আসে মনে
ভালোবাসিলেই ভুলা নাহি যায় আর।
নাহি বাসিতাম যদি এত ভালো তারে
অন্ধ হয়ে প্রেমে তার মজিতাম নারে

যদি নাহি দেখিতাম   বিচ্ছেদ না জানিতাম
        তা হলে হৃদয় ভেঙে যেত না আমার।
আমারে বিদায় দাও যাই গো সুন্দরী,
যাই তবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাকো তুমি থাকো সুখে, বিমল শান্তির বুকে
        সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

এই অনুবাদটি মূল কবিতার আক্ষরিক অর্থ, বাক্য পরম্পরা এবং ভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

১.৬ সারাংশ

উনিশ শতকে বাংলাদেশের ভাবজীবনে রেনেসাঁস বা নবচেতনা দেখা গিয়েছিল। এই সময় সেকালের উন্নত ও প্রগতিশীল মনীষীরা ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে শিক্ষা-সংস্কৃতি আন্দোলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুসরণ দেখা দিয়েছিল, আর পরবর্তী অর্ধে এই অনুসরণের ফলে গড়ে ওঠা নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সাহায্যে বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জন্য নতুন সাহিত্য গড়ে উঠল। আর এই প্রয়োজনেই অনুবাদের ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন হল। সংস্কৃত, ফরাসি ও ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকে অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা শুরু হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরির 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' ইংরেজি থেকে করা প্রথম অনুবাদ। বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অনুবাদমূলক। এর পাশাপাশি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্রমথ চৌধুরী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এরপরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্যের বহু সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। ছোটবেলার গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে কবি 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেন। তবে অনুবাদটি আক্ষরিক নয়। এর পাশাপাশি তিনি ম্যুর, বায়রন, বার্নস প্রমুখ কবির বিভিন্ন কবিতাও অনুবাদ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কিছু অনুবাদ করেছিলেন।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যেরও কিছু অনুবাদ হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল।

এই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে কয়েকটি কারণ ধরা হয় তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখা যায়, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপিত করার জন্য সংস্কৃত-পুরাণাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়। আরেকটি মতে,—গৌড়ের সুলতানরা সিংহাসনে বসে রাজসভার পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার আগ্রহ জানালে এসব গ্রন্থের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৃতীয়

একটি মতে,—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনি কবিদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা কাব্যগুলির সাহিত্যরসে মুগ্ধ হয়ে সেগুলির অনুবাদ করেছিলেন।

ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি পালি এবং প্রাকৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদও বাংলায় হয়েছে। যেমন—কল্পসূত্র, দশবৈকালিক সূত্র, গাথাসপ্তশতী ইত্যাদি।

অনুবাদ নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন—(১) আক্ষরিক অনুবাদ। এই ধরনের অনুবাদে মূল রচনার আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়। (২) ভাবানুবাদ—এই ধরণের অনুবাদে বক্তব্যের ভাব বজায় রেখে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে তা পরিবেশন করা হয়। (৩) কবিতার অনুবাদ—এই অনুবাদ আক্ষরিকও হতে পারে আবার ভাবানুবাদও হতে পারে। এছাড়াও আংশিক অনুবাদ, বিকৃত অনুবাদ ইত্যাদিও লক্ষ করা যায়।

১.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন :

১. অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
২. বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদচর্চা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের উদ্ভবের মূলে কী-কী কারণ স্বীকৃত হয়ে থাকে ?
৪. আক্ষরিক অনুবাদ বলতে কী বোঝায়, সংজ্ঞা সহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. ভাবানুবাদ কাকে বলে উল্লেখ করে উদাহরণ দিন।
৬. কবিতার অনুবাদ বলতে কি বোঝায় ; উদাহরণ দিন।
৭. **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**
   ক) ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।
   খ) বাংলা ভাষার—ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের—অনুবাদমূলক।
   গ) কথাসাহিত্য অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন—।
   ঘ) 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি ম্যুরের—এর অনুবাদ।
   ঙ) রমেশচন্দ্র দত্ত—অনুবাদ করেছিলেন।
৮. **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :**
   ক) 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' গ্রন্থটির রচয়িতা—
      ১. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
      ২. তারিণীচরণ মিত্র
      ৩. হরিমোহন গুপ্ত
   খ) বিপিনবিহারী চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন—
      ১. অপূর্ব দেশভ্রমণ

২. অদ্ভুত দিগ্বিজয়

৩. পরিত্যক্ত গ্রাম

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)’ কবিতাটি—

১. আক্ষরিক অনুবাদ

২. ভাবানুবাদ

৩. কবিতার অনুবাদ

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১. কালিসাধন মুখোপাধ্যায় — পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ

২. বুদ্ধদেব বসু — কালিদাসের মেঘদূত

৩. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় — সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ২ ❐ অনুবাদের সমস্যা এবং সমাধান

২.১ প্রস্তাবনা
২.২ অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে (১)
২.৩ সারাংশ
২.৪ অনুশীলনী
২.৫ অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে (২)
২.৬ সারাংশ ২
২.৭ অনুশীলনী ২
২.৮ উত্তরমালা
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

২.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে অনুবাদ করতে গেলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেগুলি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসগত বিভিন্ন দিক থেকে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা আছে। এছাড়া কবিতার অনুবাদকালে শিল্পরূপায়ণ এবং ছন্দগত দিক থেকে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাও এখানে বলা আছে। প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়, তার কথাও এখানে পাওয়া যাবে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে অনুবাদের সমস্যার নানা ধরণের সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদের সার্থকতার পেছনে পাঠকের যে একটা বড় ভূমিকা থাকে, সে কথাও এখানে বলা হয়েছে। অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন এবং পরিমার্জনা করতে হয়। এইভাবে অনুবাদ করলে অনুবাদক ও রচনাকারের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না, ফলে অনুবাদকের মাধ্যমে মূল রচনার যেন নবজন্ম (transcreation) হয়ে থাকে এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্প হয়ে ওঠে।

আপনি এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। বিষয়বস্তুও সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। ভালো করে এককটি পাঠের পরে অনুশীলনীগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

২.২ অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে (১)

আগের এককের মধ্যে আমরা অনুবাদের চর্চা কেন করা হয় এবং অনুবাদের নানা প্রকার প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা অনুবাদ করতে গেলে যে-যে সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সেইসব সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব।

দেশ-কালের দূরত্ব দূর করবার জন্য যে কয়েকটি উপায় আছে, তার মধ্যে অনুবাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একটি ভাষা থেকে, অনুবাদক যখন কোনো গদ্য বা পদ্য অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে যান, তখন দেখা দেয় নানারকম অভাবিতপূর্ব সমস্যা। এই সমস্যা নানাভাবে দেখা দিতে পারে। যেমন—ভাষাগত দিক থেকে, ভাবগত দিক থেকে, শব্দবিন্যাসের দিক থেকে ইত্যাদি।

এবারে আমরা অনুবাদ করতে গেলে যে-যে সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

অনুবাদকের উদ্দেশ্য যতটা পরিমাণে মূল লেখকের উদ্দেশ্যের সমধর্মী হয়, অনুবাদকের শিল্পপ্রকরণও ততটা পরিমাণে মূলানুগত হয় এবং অনুবাদ হয় সার্থক। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদচর্চার ব্যাপারটি দেখানো যেতে পারে। তাঁর অনুবাদ কর্মের প্রথম দিকে পাওয়া যায় 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাইনিদের সংলাপ। এ অনুবাদ তাঁর ভাষাশিক্ষার অঙ্গ ছিল, ভাষার চর্চাই ছিল এখানে মুখ্য। যদিও তিনি পুরো 'ম্যাকবেথ' নাটকটিই অনুবাদ করেছিলেন, তবু এই অংশটি ছাড়া বাকিটা লুপ্ত। এই অনুবাদে দেখা যায় শব্দগত দিক থেকে অনুবাদক যথেষ্ট য-বান। অনুবাদের কয়েক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ নিজে কিছু গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—শেক্সপিয়রের লেখাতে রয়েছে : "Give me" quoth I / "Aroint thee' witch!" the rumpfed ronyon cries. এটাই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে করেছেন এভাবে : চাইলুম তার কাছে গিয়ে / পোড়ামুখী রেগে / 'ডাইনী মাগী, যা তুই ভেগে'...আক্ষরিক শব্দানুবাদ করেননি তিনি। কিন্তু মূল ভাবরূপের নিখুঁত এক অনুবাদ করা হয়েছে এখানে। এর ফলে অনুবাদ হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত। ফলে মূল নাট্যরচনার সংলাপের প্রতি অনুবাদকের আকর্ষণ মূল নাট্যকার ও অনুবাদকের উদ্দেশ্যকে এক করেছে।

সুতরাং যেমন মৌলিকরচনায়, তেমনি অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি জরুরি প্রশ্ন হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। বাংলা ভাষার লেখকের পক্ষে সমস্যাটিকে এভাবে দাঁড় করানো যায়—লেখার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার শব্দের মাত্রাবিতরণ কী রকম হবে, কাব্যিক রীতি বা পুরোনো ভাষা কোন্ পর্যন্ত প্রশ্রয় পাবে ?

দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে প্রতিটি শব্দেরই আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে না। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও তার ভাষান্তরিত প্রতিশব্দের একই রকম মিল পাওয়া অসম্ভব। এছাড়া বাক্য রচনাতে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার পার্থক্য এই যে, বিশেষণ বাক্যাংশ (অর্থাৎ Adjective clause) বাংলায় কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তারপরে আসে বিশেষণ-বাক্যাংশ। যেমন, বাংলাতে বলা হয়—"Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা নীল নদের জলে স্নান করিতেছিল।" এখানে "সুন্দরী বালিকা" কর্তৃপদ। "Rhodopis নামে" তার

আগে বসেছে। কিন্তু ইংরেজিতে তা পরে বসে— "A beautiful girl named Rhodopis" সমস্তটা মিলে কর্তা। ইংরেজিতে সাধারণত কর্তার কিছু পরে, কখনো বা আগে ক্রিয়াপদ বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে। ইংরেজিতে 'স্নান করিতেছিল' ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরেই বসবে। তা হলে বাক্যটা এরকম হবে "A beautiful girl named Rhodopis was bathing" বাংলায় 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ নেই—আমরা 'জলগুলি' কখনোই বলি না, ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতেও 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ হতে পারে, এখানে তাই হয়েছে। "A beautiful girl named Rhodopis was bathing in the water of the Nile". 'River' শব্দটি এখানে না দিলেই ভালো হয়।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে কঠিনতম সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। যে-কোনো শিল্প অতি জটিল, গভীর, রহস্যময়। যেমন—কবিতার শিল্প। কবি তাঁর আবেগ ও চিন্তাতরঙ্গাকে সংহত ও ঘন করে তোলেন রূপগ্রাহ্য চিত্রে—যাতে কবির বিশিষ্ট অনুভূতির অভিজ্ঞতা অন্য সব সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা ও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। এই 'চিত্র' হল—কবির মনের সকল স্মৃতি-অনুষঙ্গা থেকে নির্মিত 'চিত্রকল্প' (অর্থাৎ, image)। কবিতাটি এই সবের অচ্ছেদ্য সমন্বয় ও সৌষম্যে অনবদ্য হয়ে ওঠে। এই শিল্পরূপের অনুসরণ অনুবাদের সার্থকতায় যেমনই মূল্যবান তেমনই সমস্যা-সংকুল। এই ধরণের সমস্যা সাধারণত কবিতার অনুবাদকরাই উপলব্ধি করেছেন।

কবিতার অনুবাদকালে ছন্দগত দিক থেকেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। সাধারণত শব্দবিন্যাসে এক ভাষার সঙ্গো অন্য ভাষার উচ্চারণের রীতি অনুসারে 'ঝোঁক' (stress)-এর একটা পার্থক্য থাকে। লাতিন কবিতায় প্রচুর স্বরাঘাত থাকে এবং সে স্বরাঘাতের নানা নিয়মও থাকে নির্দিষ্ট। কিন্তু ইংরেজি পদ্যছন্দে কানে শোনা স্বরের দৈর্ঘ্যের ওপর স্বরাঘাতের পরিমাণ নির্ভর করে। সেইজন্য এক ভাষার কবিতার ছন্দকে অন্য ভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়। তবে যদি দুটি ভাষার মধ্যে শব্দব্যুৎপত্তি, বিশিষ্ট বাক্‌রীতি, ধাতু ও ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকে, যেমন ইংরেজির সঙ্গো ফরাসি বা জার্মান ভাষার, অথবা সংস্কৃতের সঙ্গো প্রাকৃতের ও বাংলা ভাষার, সেখানে মূল ছন্দ অনুবাদ করা তেমন কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় 'মেঘদূত' এবং 'গীতগোবিন্দ'-এর আংশিক অনুবাদে আর বিদ্যাপতির দু-একটি পদের অনুবাদে মূল কবিতার ছন্দ রক্ষা করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও দুই ভাষার মধ্যে ঝোঁকের পার্থক্য আছে। বাংলায় প্রতিটি অক্ষরের মাত্রা সমান। অক্ষরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। তাই বাংলা রীতি অনুসরণ করলে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় রক্ষা করা যায় না।

আবার ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের গঠনেও শব্দোচ্চারণ রীতির পার্থক্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গো রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক এন্ডারসনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন—"ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই ছন্দসংগীত মুখরিত হইয়া ওঠে...বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে এক সঙ্গো অনেকগুলো শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গো সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না।" যেমন এডগার অ্যালান পো-র 'র‍্যাভেন' কবিতার এই দুটি চরণের অনুবাদ

"Ah, distinctly I remember

It was in the bleak December"

রবীন্দ্রনাথ এভাবে করেছেন,—

"আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাঝে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, ইংরেজি ছন্দটি চৌপদী বলে ধরে একটি ঝোঁকে তিনি চার মাত্রা ধরে অনুবাদ করেছেন, ইংরেজি ছন্দে এভাবে চার মাত্রা ধরা যায় না। তাই ইংরেজি শব্দের স্বাভাবিক ঝোঁক বাংলায় নেই বলে—অনুবাদটি মূল কবিতার ধ্বনিরূপ ও ছন্দের প্যাটার্ন রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের বাংলা রূপায়ণ অমিত্রাক্ষর। কিন্তু বাংলা ধ্বনিপ্রবাহে ইংরেজির মতো ঝোঁক না থাকায় ইংরেজি ছন্দের যথার্থ প্রতিরূপ বাংলায় প্রায়শই পাওয়া যায় না। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের প্রতি চরণের শেষে একটি ধ্বনির অনুরণন থেকেই যায়। বাংলা ছন্দে তা পাওয়া যায় না। তাই অনুবাদের সার্থকতার জন্য মূল ছন্দ অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্বাধীনতা কিছুটা পরিমাণে মেনে নিতেই হবে। আবার পদ্যের অনুবাদ গদ্যে পরিবেশন করতে গেলেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। একটি কবিতার মূল ভাব গদ্যে অনুবাদ করা হলে কবিতার অর্থ, শব্দ রক্ষা করা গেলেও সেখানে কবিতার যে একটা তান আছে, তা পাওয়া যায় না। তাই সেখানে কোনো ভাষার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদ কখনোই মূলানুগত্য রক্ষা করতে পারে না। করাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ তাতে রসের উপলব্ধিটাই ব্যাহত হবে। তবে সতর্ক অনুবাদক যদি মূল কবিতার চলনকে অনুবাদে অন্তত কিছুটাও প্রতিধ্বনিত করতে পারেন, তাহলে ছন্দগত পার্থক্যটুকু অনেকটাই কমে আসে। যেমন

"উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রোদ্রে
চঞ্চল পাখ্‌নায় উড়ছে
নিঃসীম ঘন নীল অম্বর
গ্রহ তারা থাকে যদি
থাক নীল শূন্যে।

বিমলচন্দ্র ঘোষের এই কবিতা, "দুলকি চালের মাত্রাবৃত্ত" : ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৪, ৪ + ৪ + ৪ + ৩, এই ভাবে চলেছে। এই চলন্‌টাকে ধরেই অনুবাদককে এগোতে হয় এভাবে—

"A glitt'ring group of pigeons
Gliding beneath the sun-rays
Restless wings are gliding
Sapphire cosmos unbarr'd
Let stay planets and starlets, let stay."

(পল্লব সেনগুপ্ত)

—মূলত চতুর্মাত্রিক (শেষ পর্বে ত্রিমাত্রিক) আয়াম্বিক ছন্দের মাধ্যমে এটা করা গেছে বলেই মূলের তাল ও সুর দুইই অনেকটা প্রতিফলিত হতে পেরেছে এই অনুবাদে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল প্রতিশব্দের ব্যবহার। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার বহু শব্দ প্রায় একইরকম। তবু অনুবাদ করতে গেলে মূল ভাব সবসময় বজায় রাখা যায় না যে, তা অনুবাদ বিশেষজ্ঞ জে. ও'ব্রায়েন সুন্দর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। টি.এস. এলিয়টের "rats' feet over broken glass"-এর সঠিক ফরাসি অনুবাদ "La course des rats sur les debris de verre." এটি আক্ষরিক ভাবে মূলের অনুবাদ হল না। "La course des rats" মানে ইদুঁরের পা নয়, ইদুঁরের চলা। এখানে "Les pattes" বললে ইদুঁরের পা থাকবে, কিন্তু চঞ্চলতা থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম জীবনে "Woodbine"-কে "মল্লিকা" করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে 'সাধনা'-য় হাইনের একটি অনুবাদে "নীল বায়োলেট নয়ন" বলে বিদেশি শব্দই ব্যবহার করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যার কথাও বলতে হয়। কবি স্বয়ং যদি তাঁর কোনো লেখার অনুবাদে ব্রতী হন, তাহলেও যে এ-ধরনের কিছু সমস্যা হবে না এমন নয়। ফলত, অন্য কেউ অনুবাদ করতে গেলে, তিনি মূলের প্রতিটি শব্দ, চিত্রকল্প, বাক্‌প্রতিমা ইত্যাদি সম্পর্কে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করবেন (অন্তত করতে চেষ্টা করবেন) সেটা কবি স্বয়ং অনুবাদ করলে সম্ভাব্য নয় যে, তার প্রমাণ জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার স্ব-কৃত অনুবাদ।

উদাহরণ হিসেবে দেখুন :

১(ক) "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"

(খ) "At moments when life was too much of sounds
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom."

কবির স্ব-কৃত এই অনুবাদে "ক্লান্ত প্রাণ" এবং "জীবনের সমুদ্র সফেন" নিরুদ্দেশ এবং "দু-দণ্ড শান্তি"-র বদলে "wisdom" ব্যবহৃত হয়ে ছবিটাই বদ্‌লে গেল। অথচ, দ্বিতীয় কোনো অনুবাদক এখানে যে রকম করেছেন, তা প্রায় মূলানুগ :

(গ) "I'm a weary soul : the foamy waves of life wafted at large
I had a momentary bliss with Banalata; she came from Natore."

২(ক) ".....বলেছে সে, এত দিন কোথায় ছিলেন?"
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

(খ) "I have also seen her, Banalata Sen of Natore."

মূলে, বনলতার ঐ প্রশ্ন এবং পাখির নীড়ের সঙ্গে উপমিত তার চোখে—এই দুয়ে মিলে যে-বাক্‌প্রতিমা গড়েছে, সেই অনবদ্য ভাবনাটি কবির নিজের অনুবাদে একেবারে নিশ্চিহ্ন! অথচ, অন্য অনুবাদক সেটাকে সাধ্যমতো রাখারই প্রয়াসী হয়েছেন :

(গ) “.....She, lifting her nestling eyes
Asked me, ‘Where hast thou been so long, Monsieur?’
She, that Banalata of Natore.”

—“এতদিন কোথায় ছিলেন?”-এর মধ্যে সম্বোধনের দূরত্ব এবং সম্পর্কের নৈকট্য যেভাবে সমন্বিত আছে, অনুবাদে সেটা মেলানো অত্যন্ত দূরহ; তবু ফরাসি ‘মঁসিয়ে’ খানিকটা কাছাকাছি যায়, যা ইংরেজি ‘স্যার’-এ আসে না। “নেস্‌লিং আইজ” “পাখির নীড়ের মতো চোখ”—এর ভাবানুবাদ; ‘নেস্ট-লাইক’ বা ‘নেস্টলি’ করলে—মূলের আরও কাছাকাছি যেত ঠিকই, কিন্তু প্রথম শুদ্ধ হলেও গদ্যময়, দ্বিতীয়টি শ্রুতিমধুর বটে, কিন্তু অশুদ্ধ শব্দ! [(গ)-অংশগুলি পল্লব সেনগুপ্তের অনুবাদ]

আসলে, নিজের কবিতা নিজে অনুবাদ করলে প্রায় ক্ষেত্রেই যে, সেটি ‘অনুবাদ’ না হয়ে নূতন একটি কবিতায় পরিণত হয়। এ জিনিস যে হামেশাই ঘটে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ এবং তাঁর নিজের অনূদিত ইংরেজি ‘Gitanjali’-যা নিয়ে বিশদভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৩ সারাংশ

একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় কোনো সাহিত্য অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসেগত নানা সমস্যার উদ্ভব হয়।

অনুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। দুটি ভিন্ন ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের মিলও পাওয়া যায় না। আবার বাংলাতে বিশেষণ বাক্যাংশ যেমন কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে বসে, তারপরে বিশেষণ বাক্যাংশ বসে। ইংরেজিতে ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরে, কখনো আগে বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। এছাড়া ছন্দগত দিক থেকেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যা দেখা যায়। উচ্চারণ রীতি অনুসারে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার ঝোঁকের একটা পার্থক্য থাকে। সেজন্য একভাষার কবিতার ছন্দকে অন্যভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়, আবার একটি কবিতাকে গদ্যে অনুবাদ করা হলে, কবিতার যে তান আছে, তাও অনুবাদে পাওয়া যায় না।

২.৪ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন :

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) ইংরেজিতে — কিছু পরে, কখনো বা আগে সাধারণত — বসে।

(খ) অনুবাদকের ক্ষেত্রে কঠিনতম সমস্যা হল —।

২. **সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :**

(ক) বিশেষণ বাক্যাংশ বাংলায় ব্যবহৃত হয় কর্তৃপদের —

(১) আগে

(২) পরে

(৩) সঙ্গে।

(খ) বাংলায় ক্রিয়াপদ বসে বাক্যের —

(১) আগে

(২) শেষে

(৩) মাঝে।

৩. অনুবাদকালে কী-কী সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. অনুবাদকালে ছন্দোগত দিক থেকে কী ধরণের সমস্যা হতে পারে, তা বর্ণনা করুন। কীভাবে তার সমাধান করা যায়, তাও দেখান।

৫. অনুবাদের সময়ে মূলের কোনো শব্দ বা চিত্রকল্পকে হুবহু ভাষান্তরিত না-করা গেলে, কী করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়?

৬. লেখক স্বয়ং অনুবাদে ব্রতী হলে কী ধরনের সমস্যা ঘটতে পারে তার আলোচনা করুন।

২.৫ অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে (২)

অনুবাদের সাফল্যের পেছনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন রসাস্বাদনের অংশীদার সাধারণ পাঠক। সচরাচর তাঁরা মূল রচনার ভাষার সঙ্গে অপরিচিত, মূল রচনার দেশ-কাল-পরিবেশ ব্যাপারে অজ্ঞ। তাঁরা অনুবাদে উপভোগ্য রস চাইবেন। তাই অনুবাদক যখন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা কোনো সাহিত্যকে অনুবাদ করতে যান, তখন যদি তিনি তার মধ্যে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে সেই অনুবাদ পাঠকের মনে রসের সংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে। এই সমস্যার সমাধানে অনুবাদককে কয়েকটি উপায় গ্রহণ করতে হয়—তা হল গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা বার্নসের "ও ফিলি" কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ থেকে এর উদাহরণ দেওয়া যায়—

"The Woodbine in the dewy wit"

"শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হাসিত"

উদাহরণটিতে "Woodbine" পরিণত হয়েছে "মল্লিকা"-য়। কারণ "মল্লিকা" নামটি বাঙালি পাঠকের অনেক কাছাকাছি। "wit"-এর বিকল্পে 'হাসিত' শব্দটি নতুন গ্রহম করা হয়েছে। এই গ্রহণে মূল অর্থকে বিঘ্নিত না করেই পরিমার্জনা করা হয়েছে।

একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রতিটি শব্দের অবস্থান, অনুক্রম, স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বন্টন, সবকিছুই একটা ঐকসুষমায় বিধৃত থাকে। যেমন একটি বিদেশি ভাষায় রচিত কবিতার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদও পরিপূর্ণভাবে মূলানুগত্য রক্ষা করতে পারে না। তখন অনুবাদকের কল্পনাশক্তি ও কাব্যচেতনা, যতটা সম্ভব শব্দের পরিমার্জনা বা নতুন শব্দ প্রয়োগের উপায়কে গ্রহণ করে। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের কল্পনাশক্তি, নতুন শব্দ প্রয়োগ মূল কবির কাছাকাছি হলে, শব্দের গ্রহণ, বর্জনের মধ্যে দিয়েও মূল কবিতার ভাব ; রূপ, রস লাভ করা যায়।

তাই পাঠক মনোরঞ্জনই সবসময় অনুবাদের মূল লক্ষ্য নয়। অনুবাদক একটি রচনা পড়ে যে-আনন্দ উপভোগ করেন, সেই আনন্দ-ই তাঁকে অনুবাদকর্মে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের মধ্যে উদ্দেশ্যের বিরোধিতা থাকে না, আবার পাঠকের সঙ্গে যেটুকু বিরোধ, তাও গৌণ হয়ে যায় এবং তখনই অনুবাদ এক নতুন শিল্প হয়ে ওঠে।

অনুবাদচর্চায় অনুবাদকের উদ্দেশ্য তাঁর অনুবাদের সার্থকতার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

১. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু, রসরিক্ত।

২. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা না থেকেও কিছু ভিন্নতা থাকলে অনুবাদে মূলানুগত্যের দিকে য- হয় কম, যদিও অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও রসের উপভোগই প্রধান হলে—অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

৩. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের একপ্রাণতা ঘটলে অনুবাদে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন দেশজ সংস্কার রক্ষা করেও যথাসম্ভব মূলানুগত্য এবং রচনার সার্বিক সৌন্দর্য রক্ষা সম্ভব হয়।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করার সময়, লেখায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের মাত্রাবিতরণ কি রকম থাকবে, সেই সমস্যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে, এখন আমরা পুরোপুরি বাংলাতেই লিখে থাকি, অর্ধেক সংস্কৃতে নয়,—সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় অনেক কমে গেছে, দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার প্রায় লোপ পেয়েছে, যতি-চিহ্নের প্রয়োগ অনেক বেড়েছে এবং শব্দব্যবহারে সংস্কৃত ও দেশজের মিশ্রণ অনেক বেড়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর মেঘদূতের অনুবাদে আধুনিক বাংলার পাশাপাশি 'অম্বু', 'অম্ভোজ'—ইত্যাদি শব্দ যা আধুনিক বাংলায় অপ্রচলিত, তাও ব্যবহার করেছেন। এছাড়া 'যুবতী-জল-কেলি-সৌরভ' ইত্যাদি দীর্ঘ সমাসও ব্যবহার করেছেন। এর পাশাপাশি 'যবে', 'পুন' ইত্যাদি কাব্যিক শব্দ, 'ললনা', 'অঙ্গনা', 'প্রমদা' ইত্যাদি প্রতিশব্দও অনুবাদে ব্যবহার করেছেন। এইভাবে খাঁটি বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা ও ভঙ্গির মিশ্রণে অনুবাদটি সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাপকভাবে সংস্কৃত শব্দ—যাদের অনেকগুলিই অপ্রচলিত—ব্যবহার করেছেন। বরং বিষ্ণু দে অনুবাদে প্রচলিত—এমনকী লৌকিক বাক্‌রীতি-নির্ভর শব্দও প্রয়োগ করেছেন অনেক সময়। এই সূত্রে বলি : সুধীন্দ্রনাথের 'প্রতিধ্বনি', বিষ্ণু দের 'হে বিদেশী ফুল', 'এলিয়টের কবিতা', বুদ্ধদেবের 'শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা', 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা', 'রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হুইটম্যানের কবিতা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত

সংকলন 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত', নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'Book of Bengali Verse'-ইত্যাদি বই গত কয়েক দশকের উল্লেখযোগ্য কাব্যানুবাদ সংগ্রহ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্সপিয়ারের 'রোমিও জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদচর্চার আদর্শ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তার থেকেই অনুবাদ করতে গেলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় তাদের কয়েকটি সমাধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল, —

(১) বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদচর্চা একান্তই প্রয়োজনীয়। তবে বিদেশি স্থান-কাল ও রুচিগত ঐতিহ্য—স্বদেশের স্থান-কাল ও রুচিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই অনুবাদককে দেশের পাঠকের রুচির দিকে লক্ষ্য করে অনুবাদের পরিমার্জনা, পরিবর্তন করতে হবে।

(২) মূল রচনার স্থান ও ব্যক্তিনাম অনুবাদে পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু চরিত্র, মূলভাব ও মূলকাহিনি যথাসাধ্য রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তবে স্বয়ং হেমচন্দ্রই যে, রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনিতে কলকাতার গড়ের মাঠের উল্লেখ করেছেন, তেমন রূপান্তরণ আদৌ বাঞ্ছিত নয়।

(৩) যথাযথ অনুবাদের জন্য, অনুবাদকে উন্নত করার জন্য অনুবাদক স্থানে-স্থানে নিজস্ব কল্পনার আশ্রয়ও নিতে পারেন।

অনুবাদের সময় অনুবাদক ও রচনাকারের মধ্যে যখন প্রকাশ ভাবনার ক্ষেত্রে বিরোধ থাকে না, তখনই সার্থক অনুবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার প্রভাব অনুবাদকের মনকে যেমন উদ্দীপ্ত করে, তেমনি সমকালীন পাঠকের সাহিত্য-মানসেও তার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। সমকালীন পাঠকের দাবী ও সংস্কারের সঙ্গে অনুবাদকের সম্ভাব্য বিরোধগুলি যথাসম্ভব অতিক্রান্ত হলে—অনুবাদকের ভাব ও রূপের আস্বাদন সমকালীন পাঠকের কাছে নতুন এক সাহিত্য ঐতিহ্য হিসেবে প্রতীত হয়ে ওঠে। সূক্ষ্মতরভাবে এই প্রভাব সঞ্চারিত হয় সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে, যাঁরা নতুন ভাবস্পন্দন ও রসের সন্ধান করেন। অনূদিত সাহিত্য অনুবাদের ভাষার সাধারণ অনুষঙ্গ ও ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে অন্বিত হলে উন্মেষশীল সাহিত্য নির্মাতাদের প্রভাবিত করে ; সাহিত্যে নতুন ভাব ও আঙ্গিক নির্মাণে, শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা, তাঁদের সাহিত্য চেতনায় এনে দেয়। সামগ্রিকভাবে এক নতুন ভাব-ঐশ্বর্য সেই ভাষার সাহিত্যে সংযোজিত হয়।

অনুবাদের বৃহত্তর সার্থকতা এই যে, তা সার্বিকভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, এক নতুন সৌন্দর্যের জগৎ সেই ভাষাভাষী পাঠকের চেতনায় সঞ্চারিত হয়। যে-রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়েনি, সার্থক অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তার অভিনব আবির্ভাব আমাদের নান্দনিক-চৈতন্যকে পরিপূর্ণভাবে ঋদ্ধিমান করে তোলে।

২.৬ সারাংশ

সাধারণ পাঠকরাই একটি অনুবাদের সাফল্যের বিচার করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তাই অনুবাদক যদি অনুবাদে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে তা পাঠকের রসসংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। তখন অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে, এজন্য অনুবাদকালে উদ্ভূ ত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা করতে হয়।

তবে সবসময় শুধু পাঠকই কোনো অনুবাদের মূল লক্ষ্য নন। অনুবাদক একটি রচনা পাঠ করে যে-আনন্দ উপলব্ধি করেন, তাই তাঁকে অনুবাদ করতে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকে না এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। কারণ মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু।

তবে আদর্শ অনুবাদের সার্থকতা এই যে, তা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের নান্দনিক চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

২.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) অনুবাদের সাফল্যের পেছনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন রসাস্বাদনের অংশীদার সাধারণ—।

(খ) অনুবাদের সময় অনুবাদক ও — মধ্যে যখন বিরোধ থাকে না, তখন—নবসৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. **সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :**

(ক) সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় —

(১) কমেছে

(২) বেড়েছে

(৩) একইরকম আছে

(খ) শেক্সপিয়রের ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ নাটকের অনুবাদ করেছেন—

(১) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩) বুদ্ধদেব বসু

৩. অনুবাদকালে সঞ্জাত সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৪. অনুবাদ কীভাবে এক নতুন ধরনের শিল্প হয়ে উঠতে পারে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

২.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১. (ক) কর্তার, ক্রিয়াপদ।

(খ) শিল্পরূপায়ণের।

২. (ক) আগে

(খ) শেষে

৩ এবং ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

৫ এবং ৬ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য '২, ৩' অংশের শেষ দিকের অনুচ্ছেদগুলি ভালভাবে পড়ুন।

অনুশীলনী ২

১. (ক) পাঠক।

(খ) রচনাকারের, অনুবাদের।

২. (ক) কমেছে।

(খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ এবং ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অনুবাদচর্চা (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪ খণ্ড) ;

২. কালিসাধন মুখোপাধ্যায় - পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ ;

৩. বুদ্ধদেব বসু - কালিদাসের মেঘদূত ;

৪. পল্লব সেনগুপ্ত - অনুবাদের ভাষা : কবিতার অনুবাদ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ৭ম-৮ম সংখ্যা, ১৯৯০) ;

৫. মঞ্জুভাষ মিত্র - আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব।

১.০ প্রশ্নমালা (Questionaire)

সমাজ-গবেষণা, বিশেষত সমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নমালার (questionaire) ব্যবহার বহুল প্রচলিত। বিশাল, বৈচিত্র্যময় ও ছড়িয়ে-থাকা গোষ্ঠীগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার এটি এক উপযোগী ও বিশ্বস্ত পদ্ধতি। শুধুমাত্র ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও পরিমাণগত তথ্য নয়, গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্যও প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সামাজিক পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু বিশেষ ব্যতিক্রম বাদ দিলে, অন্যান্য বেশীর ভাগ গবেষণার কাজে এই পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গো একসাথে প্রয়োগ করা হয়।

প্রশ্নমালা হল প্রশ্নের এক তালিকা যা উত্তরের জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছে পাঠানো হয় এবং যার ফলাফলকে একটি প্রমিত আকারে সারনিবন্ধ করা যায় ও সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে বিচার করা যায়। গুডি ও হাট (Goode, W.J. & Hatt, P.K., Methods in Social Research, McGraw-Hill, 1952) একে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করার এক পদ্ধতি বলেছেন, যাতে এক নিদর্শ বা ফর্ম অনুসরণ করে উত্তরদাতা নিজেই সেই ফর্ম ভর্তি করেন। 'ডিকশনারি অফ স্ট্যাটিসটিকাল টার্মস' অনুযায়ী, প্রশ্নমালা হল, "প্রশ্নের এক সমাহার বা ক্রম, যার লক্ষ্য কোনও বিষয় বা বিষয়গুচ্ছের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি সম্পর্কে আরও ভাল করে অবহিত হওয়া।"

১.১ প্রশ্নমালা-তথ্যসারণি (Questionaire-schedule)-সাক্ষাৎকার সহায়িকা (Interview guide)

কোনও কোনও সময়ে 'প্রশ্নমালা', 'তথ্যসারণি' ও 'সাক্ষাৎকার সহায়িকার' মধ্যে প্রভেদ করা হয়। প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা বা সংবাদদাতা নিজেই ফর্ম ভর্তি করে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে থাকেন। সাধারণত ডাকে পাঠানো এই ফর্ম ভর্তির সময়ে উত্তরদাতাকে সহায়তা করার জন্য গবেষক বা প্রেরক নিজে উপস্থিত থাকেন না। তথ্যসারণি বা সেডিউলের ক্ষেত্রে কিন্তু গবেষক বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতার মুখোমুখি বসে নিজেই প্রশ্ন সংবলিত ফর্মটি ভর্তি করেন এবং প্রয়োজনমত উত্তরদাতাকে সাহায্য করেন। সাক্ষাৎকার-সহায়িকায় বিষয় বা বক্তব্যের একটি গুচ্ছ থাকে, যেটি অনুসরণ করে সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারী উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এটি একটি খুবই উপযোগী পদ্ধতি, কারণ এতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গবেষণার সবকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে সাক্ষাৎকারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কখনও কখনও প্রশ্নমালা বা তথ্যসারণিকে সাক্ষাৎকার-সহায়িকা হিসাবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সমীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের ও বৈচিত্র্যময় তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রশ্নমালা ও তথ্যসারণি উভয়েই বেশী করে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। যেখানে উত্তরদাতারা এক বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছেন, সেখানে বিশেষ করে প্রশ্নমালার ব্যবহার আরও বেশী উপযোগী ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। এর আর একটি সুবিধা হল বাইরের প্রভাব থেকে উত্তরদাতাকে মুক্ত রাখা। এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতা তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও

বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। বাইরের প্রভাব ছাড়া সংগৃহীত তথ্য সব সময়েই বেশী বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য হয়।

১.২ প্রশ্নমালার বিভিন্ন স্বরূপ

প্রশ্নমালাকে মোটামুটি দু ভাগে বিভক্ত করা যায় : পরিকল্পিত প্রশ্নমালা ও অপরিকল্পিত প্রশ্নমালা। পউলিন ভি. ইয়ঙের মতে, "পরিকল্পিত প্রশ্নমালাতে কিছু নির্দিষ্ট পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্ন করা হয়, অর্থাৎ প্রশ্নগলিকে আগেভাগেই প্রকৃত নেওয়া হয় এবং ঘটনাস্থলেই প্রশ্ন করার সময় সেগুলিকে স্থির করা হয়না।" অতিরিক্ত প্রশ্নের কথা তখনই চিন্তা করা হয় বা জিজ্ঞাসা করা হয়, যখন উত্তরদাতার কাছে থেকে কোনও অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা তথ্যের প্রয়োজন হয়। বয়স, বৈবাহিক অবস্থান, সন্তানসন্ততির সংখ্যা, জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই পরিকল্পিত প্রশ্নমালার মধ্যে পড়ে এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তর অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হতে পারে না।

পরিকল্পিত প্রশ্নমালাকে আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যাদের আবদ্ধ (closed-form) ও উন্মুক্ত (open-end) প্রশ্নমালা বলা যেতে পারে। প্রথমটিতে এমন প্রশ্ন করা হয়, যেগুলির বিকল্প উত্তরের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এটি দুটি হতে পারে : (১) যেখানে 'হ্যাঁ' বা 'না' ছাড়া কোনও বিকল্প উত্তর থাকা সম্ভব নয় এবং (২) যেখানে উত্তরদাতাকে এক সীমিতসংখ্যক উত্তর থেকে নিজের উত্তরটিকে বেছে নিতে হয়। দ্বিতীয়টি অবশ্য উত্তরদাতাকে তাঁর নিজস্ব ভাষা শৈলী, ধারণা প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। এই ধরণের প্রশ্নমালা সচরাচর তন্নিষ্ঠ বা পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কিছু কিছু উত্তরদাতা অবাধ, অর্থহীন উত্তর দেওয়ার ফলে এ ক্ষেত্রে যথাযথ শ্রেণী বিভাজন, সারণিকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অপরিকল্পিত প্রশ্নমালাতে প্রশ্নগুলি আগে থেকে প্রস্তুত করা হয় না এবং পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করা হয়। এতে বিভিন্ন ধরণের উত্তর দেবার সুযোগ থাকে। এই ধরণের প্রশ্নমালা প্রধানত সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। নমনীয়তা এই প্রশ্নমালার অন্যতম গুণ। উত্তরদাতার কাছ থেকে সম্ভাব্য সব রকমের তথ্য সংগ্রহ করাই এর লক্ষ্য।

শিশু ও নিরক্ষর মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বহু ক্ষেত্রে সচিত্র প্রশ্নমালাও ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ ও ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ার ফলে অবশ্য এ ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

১.৩ প্রশ্নমালা গঠন

কোনও প্রশ্নমালাই সম্পূর্ণ নিখুঁত না হলেও গবেষণার অভিজ্ঞতা ও সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে মোটামুটি উচ্চ মানের প্রশ্নমালা গঠন করা সম্ভব।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতির সময়ে প্রথমেই তার বাহ্যিক রূপের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বাহ্যিক চেহারাটি

আকর্ষণীয় হলে সেটি উত্তরদাতার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের সঞ্চার করে। পউলিন ইয়ঙ মনে করেন যে, প্রশ্নমালা গঠনের সময়ে নীচের বিষয়গুলি বিবেচনা করা আবশ্যক :

১. তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পরিচয়-ফর্মের সম্মুখভাগে একটি নজরকাড়া অবস্থানে থাকা উচিত। ডাকে ফর্ম ফেরত দেবার ব্যবস্থা করলে ঠিকানার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত।

২. গবেষণার বা সমীক্ষার শীর্ষনাম সামনের পাতায় বড় হরফে থাকা উচিত। ফর্মের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলিতে বিশেষ হরফ বা অন্য কিছু ব্যবহার করা উচিত।

৩. তথ্যসংগ্রহের ভিত্তি ও অধিকার সম্পর্কে ফর্ম জানানো উচিত।

৪. তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত যাতে উত্তরদাতা নিজেকে সুরক্ষিত বোধ করতে পারেন।

৫. প্রতিবেদনটি যে সময়কালের জন্য, ফর্মে আগেই তা উল্লেখ করা উচিত, বা পরে উল্লেখ করার জন্য জায়গা ছেড়ে রাখা উচিত।

৬. পাদটীকার প্রয়োজন হলে তার জন্য সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট জায়গা রাখা উচিত।

৭. যদি না তা অপ্রয়োজনীয় হয়, তাহলে উত্তরদাতার স্বাক্ষরের জন্য জায়গা রাখা উচিত।

৮. প্রতিটি প্রশ্নমালাকে ক্রমিক সংখ্যার সাহায্যে চিহ্নিত করা উচিত যাতে কাজের সুবিধা হয়।

৯. প্রশ্নমালাতে একাধিক পাতা বা পৃষ্ঠা থাকলে প্রতিটি পৃষ্ঠাকে সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা উচিত। সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারীর অতিরিক্ত ফর্ম ব্যবহার করা প্রয়োজন হলে ব্যবহৃত প্রতিটি ফর্ম চিহ্নিত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল গবেষণার ক্ষেত্রটির পরিচয় দেওয়া এবং জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলি স্থির করা। সম্ভাব্য যে-কোনও ধরণের প্রশ্নকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতাকে ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ "দীর্ঘ ও অসংলগ্ন প্রশ্নমালা প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা উভয়কেই সমস্যায় ফেলে। এর ফলে প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য কোনও অবস্থাতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়।" পউলিন ইয়ঙ বলেন যে, "প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা হলেও সেটিই বিবেচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত নয়। প্রশ্নমালাতে বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কি না এবং গৃহীত পদ্ধতিগুলি গবেষণার দাবী পূরণ করছে কিনা, সেটাই বিবেচনার মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত।"

প্রশ্নমালাতে প্রতিটি বিষয় এমন ভাবেই উপস্থাপিত করা উচিত যে, তা উত্তরদাতার উপলব্ধির সঙ্গো খাপ খায়। দীর্ঘদিন আগে ঘটে-যাওয়া কোনও ঘটনা যা স্মরণ করা কঠিন, অথবা তাঁর পক্ষে বোঝা কঠিন এমন কোনও বিষয়, অথবা ব্যক্তিগত বা আবেগপ্রবণ বিষয়গুলি সম্পর্কে উত্তরদাতার মতামত প্রার্থনা করা উচিত নয়।

উত্তরদাতার জ্ঞানের মান সম্পর্কে কোনও অবাস্তব ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। সাধারণভাবে, উত্তরদাতার সম্পর্কে কোনও পূর্বনির্ধারিত ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা উচিত নয়। তাঁদের এই রকম কোনও ধারণা থাকা ঠিক নয় যে, গবেষণার বা সমীক্ষার বিষয়ে উত্তরদাতা অবধারিত ভাবেই কিছু জ্ঞানের অধিকারী বা একই বিষয়ে কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িত।

প্রশ্নমালার শব্দসম্ভার ও বাক্যগঠন এমন হওয়া উচিত, যা প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার মধ্যে ধারণার আদানপ্রদানকে সম্পূর্ণ ও ত্রুটিহীন করে তুলতে সহায়ক হবে।

কোনও উচ্চ মানের প্রশ্নমালা গঠনের সময়ে জনসমষ্টির গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারিগরি বা বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ বাদ দিয়ে সাধারণ, প্রাত্যহিক কথোপকথনের সময়ে ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। কোনও কঠিন শব্দের বিকল্প থাকলে সেটিকেই ব্যবহার করা উচিত।

সাধারণ মানুষের উপর গবেষণামূলক সমীক্ষা চালানোর সময় প্রশ্নের ভাষা সহজ হওয়া উচিত, যাতে প্রশ্নের সঠিক অর্থ বোঝানো যায়। জটিল ও বহুদিক-সমন্বিত বিষয়ের ক্ষেত্রে জটিল প্রশ্ন রাখার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতা দমন করে একটি জটিল প্রশ্নের বদলে অনেকগুলি সহজ প্রশ্ন রাখাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নের গঠন এমন হওয়া উচিত যা উত্তরদাতাকে সম্ভাব্য বা যথাযথ উত্তর সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত না দেয়। এমন সব প্রশ্ন এড়িয়ে চলা উচিত যেগুলি নির্দিষ্ট কোনও উত্তর দিতে উত্তরদাতাকে প্রভাবিত করে।

সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য বা বাঞ্ছনীয় নয়, এমন উত্তর দিতে উত্তরদাতাদের বাধ্য করা উচিত নয়। যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে একটিই ধারণা জড়িয়ে থাকা উচিত।

প্রশ্নমালাতে প্রশ্নের বিন্যাস এমনই হওয়া উচিত যাতে তা উত্তরদাতার কাছে সহজেই বোধগম্য হয়। প্রথম প্রশ্নগুলি উত্তরদাতার মনে আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারলে তিনি নিজেই পরবর্তী প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করবেন। প্রশ্নগুলিকে সাজানো উচিত "ফানেল পদ্ধতির" (Funnel Method) সাহায্যে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে সাধারণ, প্রশস্ত কিছু প্রশ্ন রেখে পরবর্তী স্তরগুলতে সংকীর্ণ ও নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি রাখা হয়।

নাম প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক না হলে বহু উত্তরদাতা খোলা মনে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে প্রশ্নকর্তাদের যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা উচতি।

প্রশ্নমালা প্রস্তুত করার সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না লক্ষ্য রাখা উচিত। গবেষক নিজেই তাঁর নজর-তালিকা (check list) প্রস্তুত করতে পারেন অথবা নমুনা কোন নজর-তালিকার সাহায্য নিতে পারেন। গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী এই তালিকা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এখানে আমরা পউলিন ইয়ঙ কৃত নজর-তালিকার সংক্ষিপ্ত রুপ পেশ করছি :

১.৪ প্রশ্নের বিষয়

স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য এই প্রশ্নের কী প্রয়োজন আছে? এই প্রশ্নকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে?

এই প্রশ্নের বিষয়টির উপর কী অনেকগুলি প্রশ্নের প্রয়োজন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার উপযুক্ত তথ্য কী উত্তরদাতার আছে?

প্রশ্নটি কী আরও নির্দিষ্ট ও উত্তরদাতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত?

প্রশ্নের বিষয়টি কী যথেষ্ট সাধারণ এবং মিথ্যা সুনির্দিষ্টতা থেকে মুক্ত?

প্রশ্নের বিষয়টি কী পক্ষপাতদুষ্ট বা বিশেষ এক দিকে ঝুঁকে পড়া, ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সহযোগী প্রশ্নের প্রয়োজন আছে কী।

প্রশ্নের শব্দচয়ন

প্রশ্নগুলির শব্দ নির্বাচন কী দুরূহ যাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়?

উত্তর নির্বাচনের প্রসঙ্গে প্রশ্নগুলি কী বিকল্পগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা দেয়?

কিছু অকথিত ধরাণা ও অদেখা তাৎপর্যের জন্য প্রশনগুলি ভুল পথে চালিত করে না তো?

শব্দগুলি কী উত্তরদাতাদের কাছে আপত্তিজনক মনে হতে পারে?

আরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে প্রশ্নটিকে কী আরও ভাল ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে?

১.৫ প্রশ্নের বিন্যাসক্রম

আগের প্রশ্নের বিষয়টি কী পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তরকে প্রভাবিত করতে পারে?

প্রশ্নগুলির বিন্যাস কী স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করেছে? তারা কী সঠিক মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস মেনে চলছে?

কিছু প্রশ্ন কী আগ্রহ জাগানোর ক্ষেত্রে অনেক আগে বা অনেক পরে এসেছে?

যোলটি নির্দেশ : 'হ্যাণ্ডবুক অফ রিসার্চ ডিজাইন অ্যাণ্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট' গ্রন্থে ডেলবার্ট সি. মিলার প্রশ্নমালা গঠনের জন্য যোলটি নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলি হল :

১. উত্তরদাতার জ্ঞান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করা উচিত।

২. এমন শব্দ নির্বাচন করুন যা সকলের কাছে একই অর্থ বহন করে।

৩. দীর্ঘ প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন।

৪. আগে থেকেই ধরে নেবেন না যে উত্তরদাতার কাছে প্রকৃত তথ্য আছে বা তাঁর নিজস্ব মতামত আছে।

৫. নিজের দৃষ্টিকোণকে প্রতিষ্ঠা করুন।

৬. প্রশ্ন গঠন করার সয়ে উত্তরদাতাকে হয় সবকটি সম্ভাব্য বিকল্প জানান কিংবা একটিও বিকল্প জানানো থেকে বিরত থাকুন।

৭. উত্তরদাতার আত্মমর্যাদা রক্ষা করুন।

৮. কোনও অপ্রীতিকর উত্তর আশা করলে উত্তরদাতাকে প্রথমে তাঁর ইতিবাচক চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করতে দিন যাতে তিনি কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন না হন।

৯. সিদ্ধান্ত নিন প্রশ্নটি আবন্ধ না উন্মুক্ত হবে।

১১. সিদ্ধান্ত নিন প্রশ্নটি সাধারণ, না কী নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

১২. দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দ এড়িয়ে চলুন।

১৩. পক্ষপাতদুষ্ট প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন।

১৪. এমন ভাষায় প্রশ্ন করুন যাতে সেগুলি বিনা প্রয়োজনেই আপত্তিজনক না হয়ে ওঠে।

১৫. সিদ্ধান্ত নিন ব্যক্তিগত বা নৈর্ব্যক্তিক, কোন ধরণের প্রশ্ন বেশী উপযোগী হবে।

১৬. কোনও একটি ধারণা বা প্রসঙ্গের মধ্যেই প্রশ্নটিকে সমাবন্ধ রাখা উচিত।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক সূত্রের সাহায্যে প্রশ্ন গঠন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বিকল্প প্রশ্ন ব্যবহার করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালনো প্রয়োজন, কারণ কড়া নিয়মকানুনের অনুপস্থিতিতে প্রশ্নমালা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষানিরীক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রাক-পরীক্ষা (pre-tests)

সাক্ষাৎকারের তুলনায় ডাকে পাঠানো প্রশ্নমালার উত্তর অনেক কম পাওয়া যায়। সাধারণত অল্পশিক্ষিত, নীচু স্তরে বৃত্তিতে জড়িত ও বিষয়টি সম্পর্কে অনাগ্রহী মানুষদের মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা যথেষ্ট কম হয়। এই সংখ্যা বাড়ানোর সব থেকে ভাল পদ্ধতি হল অনুসারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অর্থাৎ উত্তরদাতাদের আবার নতুন করে তাগিদ দেওয়া উত্তর দিতে অনিচ্ছুক মানুষের হার এমন স্তরে নামিয়ে আনা উচিত যাতে সমীক্ষাটি পক্ষপাতদুষ্ট বা বিকৃত না হয়ে ওঠে।

বিশুদ্ধতা ও গ্রহণীয়তা

প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্বস্ততা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। প্রধানত দুটি উপায়ে এই পদ্ধতির বিশ্বস্ততা যাচাই করা যেতে পারে :

(১) একই প্রশ্নমালা একই উত্তরদাতাকে কিছু সময়ের ব্যবধানে আবার পাঠানো যেতে পারে। দুবারই উত্তর একই ধরণের পাওয়া গেলে প্রশ্নমালাটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(২) দুটি ভিন্ন ভিন্ন নমুনার ক্ষেত্রে একই প্রশ্নমালা ব্যবহার করা যেতে পারে। উত্তরগুলির শতকরা হার ও প্রকৃতি একই রকম হলে ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একই ধরণের হলে একে বিশ্বস্ত মনে করা যেতে পারে।

মানুষ যেহেতু সময় ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গো পালটায়, সেহেতু এই দুই পদ্ধতিকে নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে না। অবশ্য জীবন ও সমাজের পরিবর্তন সত্ত্বেও এই পদ্ধতি দুটিকে মোটামুটি কার্যকর বলা চলে।

১.৬ প্রশ্নমালার সুবিধা

১. অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এটি কম ব্যয়সাপেক্ষ। উত্তরদাতারা কম সংখ্যায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকলে এবং আর্থিক সামর্থ্য সীমিত হলে, ডাকে প্রশ্নমালা পাঠানো হল সবথেকে উপযোগী পদ্ধতি।

২. ডাকে প্রশ্নমালা পাঠিয়ে উত্তর সংগ্রহ করলে সমীক্ষার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে।

৩. প্রশ্নমালা ব্যবহার করলে প্রশ্নকর্তার নিজস্ব উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। প্রশ্নমালাতে দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী উত্তরদাতা নিজেই ফর্মটি ভর্তি করতে পারেন।

৪. প্রশ্নমালা স্বভাবতই এক ব্যক্তিনিরপেক্ষ দলিল।
৫. প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে উত্তরদাতা নিজের নাম গোপন রাখতে পারেন। এর ফলে তিনি খোলা মনে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। এই কারণে প্রশ্নমালা সাক্ষাৎকারের তুলনায় বেশী উপযোগী।
৬. প্রশ্নমালা উত্তরদাতার উপর কোনও আবেগজনিত চাপ সৃষ্টি করে তোলে না। উত্তর দেবার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সময় ও স্বাধীনতা পান। এর ফলে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিতে সক্ষম হন।
৭. অপরিচিত প্রশ্নকর্তার মুখোমুখি না হয়ে অকেকেই এই পদ্ধতিতে আগ্রহের সঙ্গো ব্যক্তিগত ও অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলরি উত্তর দিয়ে থাকেন। এর ফলে প্রশ্নমালা আমাদের কাছে আরও বাস্তব এক চিত্র হাজির করতে সক্ষম হয়।
৮. প্রশ্নমালা অপরিচয়জনিত সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

১.৭ প্রশ্নমালার অসুবিধা বা সীমাবন্ধতা

১. অধিকসংখ্যক উত্তরদাতার প্রয়োজন হলে প্রশ্নমালা পদ্ধতি ততটা উপযোগী নয়।
২. আয়, যৌন আচরণ, অস্বাভাবিক কাজকর্ম ইত্যাদি ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা যথেষ্ট উপযোগী নয়, কারণ উত্তরদাতারা সাধারণত এই সব প্রশ্নের উত্তর জানাতে অনিচ্ছুক থাকেন।
৩. প্রশ্নগুলি সহজ ও সোজাসুজি না হলে প্রশ্নমালা অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করতে পারেনা।
৪. সমীক্ষার কাজে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকলে প্রশ্নমালা পদ্ধতি যথেষ্ট নয়।
৫. প্রশ্নমালার উত্তরগুলি যাচাই করে নেওয়া এবং চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া যায় না। ডাকে পাঠানো প্রশ্নমালা কার্যত এক অনমনীয় পদ্ধতি।
৬. স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর পেতে হলে প্রশ্নমালা ঠিক উপযোগী নয়।
৭. অন্যদের সঙ্গো আলোচনা বা কথোপকথনের প্রভাব থেকে মুক্ত শুধু একজন ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকর নয়।
৮. উত্তরদাতার জ্ঞানের স্তর সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য প্রশ্নমালা সঠিক পদ্ধতি নয়।
৯. প্রশ্নমালা হাতে পেলে উত্তর দেবার আগে উত্তরদাতা সাধারণত সম্পূর্ণ প্রশ্নমালাটিই একবার পড়ে ফেলেন। কাজেই উত্তরগুলি একে অপরের প্রভাবমুক্ত বলে মনে করা যায় না।
১০. যাঁর উদ্দেশে প্রশ্নমালাটি পাঠানো হয়েছে, তিনি নিজেই যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তাঁর হয়ে অন্য কারুর উত্তর দেবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণই নস্যাৎ করে দেওয়া যায়না।
১১. প্রশ্নমালা তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গো সমন্বিত উপায়ে কাজ করার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সঙ্গো সমন্বয় ঘটিয়ে প্রশ্নমালার কিছু কিছু অসুবিধা দূর করা সম্ভব।

২.০ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

যে কোনও গবেষণা বা প্রকল্পে তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী পর্যায়ে আসে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য বিশ্লেষণের কাজ।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বলতে তথ্যকে ঘনীভূত করা, পুনর্বিন্যাস করা ও নতুন ভাবে সংঘবন্ধ করা বোঝায় যা তথ্য বিশ্লেষণের কাজকে অনেক সহজ করে তোলে। তথ্য বিশ্লেষণ হল প্রকল্প বা গবেষণার প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যের পর্যবেক্ষণ করা ও যত দূর সম্ভব প্রচলিত তাত্ত্বিক সূত্রগুলরি কাছে দায়বন্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ অনেকটাই নির্ভর করে তথ্যের প্রকৃতির উপর। প্রক্রিয়াকরণ গুণগত বা পরিমাণগত- এই দুই ধরণেরই হতে পারে। তথ্য মৌখিক হলে তাকে সংখ্যাগত রূপ দেওয়া প্রয়োজন হয়, যাতে তার সম্পর্কে আরও ভালভাবে ধারণা তৈরী করা সম্ভব হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সময় যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সেটি হল তথ্যের প্রকৃতি ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক।

গবেষণার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে যদি আগেই ভালভাবে পরিকল্পনার রচনা করে নেয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতের অনেক সমস্যা এড়িয়ে দ্রুত গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি চরিত্র ও সংখ্যা, প্রকল্প বা প্রকল্পগুলির জটিলতা, উত্তরদাতার সংখ্যা ও সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনা রচনা করা যেতে পারে। সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণ সামান্য হলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ হাতেহাতেই করা সম্ভব। কিন্তু তথ্যের পরিমাণ ও জটিলতা বৃদ্ধি পেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও কমপিউটার ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়। আর্থিক ব্যয়ের দিকটি বিবেচনা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তর : এখানে মূলত সুপরিকল্পিত প্রশ্নমালার সাহায্যে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণা সমীক্ষার দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের প্রসঙ্গোই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরণের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে : (১) সম্পাদনা (২) তথ্যকে সংখ্যাগত রূপ দেওয়া (coding) ও (৩) সারণিবন্ধকরণ (tabulation) ।

২.১ সম্পাদনা

প্রশ্নকর্তা যথেষ্ট জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হলেও প্রশ্নমালাতে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন, প্রশ্নমালাতে কিছু ফাঁক থেকে যেতে পারে বা প্রশ্নগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যেতে পারে। এই ধরণের ত্রুটি দূর করার জন্য য-শীল সম্পাদনা অপরিহার্য।

অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা কোনও একটি প্রশ্ন করতে ভুলে যান বা কোনও উত্তর নথিবন্ধ করেন না। দুটি ক্ষেত্রেই উত্তরদাতাকে আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে। একই উত্তরদাতা অন্য কোনও প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তা থেকে যদি অনুপস্থিত উত্তরটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়, তাহলে তার সাহায্যেও ওই শূন্যস্থান পূর্ণ করা যেতে পারে। কোনও উত্তরের স্থানটি শূন্য রাখার থেকে আবার প্রশ্ন করে সেই

উত্তরটি সংগ্রহ করাই বাঞ্ছনীয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আবার প্রশ্ন করে পাওয়া উত্তরগুলি লক্ষ্য করা উচিত, যাতে সম্পাদনার কাজে সম্ভাব্য অসংগতিগুলি চিহ্নিত করা যায়।

প্রশ্নকর্তার দক্ষতায় পূর্ণ আস্থা থাকলে সমস্ত প্রশ্নমালার পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে নেওয়া উচিত এবং তাতে যদি কোনও ত্রুটি ধরা না পড়ে, তাহলে পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ কোডিঙের প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

এই যাচাই প্রক্রিয়ার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে : পূর্ণতা, সংগতি বা সামঞ্জস্য এবং সুষমতা (regularity)।

পূর্ণতা (completeness) : প্রথমেই দেখা প্রয়োজন প্রশ্নমালাতে সব প্রাসঙ্গিক তথ্য নথিবদ্ধ হয়েছে কী না অর্থাৎ সব কটি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা গেছে কী না। কখনও কখনও কোনও উত্তরদাতা তিনি কোন দলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন তা জানাতে অস্বীকার করেন। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা কোনও একটি প্রশ্ন করতে ভুলে যান বা কোনও একটি উত্তর নথিভুক্ত করেন না। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করলে এই ধরণের ত্রুটিগুলি এড়ানো সম্ভব হয়। যেমন কোনও উত্তরদাতা তাঁর লিঙ্গের উল্লেখ না করলে তাঁর নাম থেকে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। উত্তরদাতার পক্ষে প্রযোজ্য নয় এমন প্রশ্ন করা হলে সেখানেও শূন্য স্থান থাকা স্বাভাবিক। সম্পাদনার পর্যায়ে উত্তর না পাবার কারণগুলি চিহ্নিত করা কঠিন। সেই কারণে প্রশ্নকর্তার উচিত যে সব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা যায়নি সেগুলির উপর যথাযথভাবে দৃষ্টি দেওয়া।

উন্মুক্ত (open-ended) প্রশ্নগুলির উত্তরেরও সতর্ক যাচাই প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সচরাচর সমস্যা দেখা দেয় উত্তরের বোধগম্যতা নিয়ে। দ্রুত কাজ সেরে ফেলার জন্য প্রশ্নকর্তা অনেক সময় ধৈর্য হারান এবং অস্পষ্টভাবে উত্তরগুলি নথিবদ্ধ করেন। ব্যাকরণ বা বাননের ভুল ঢাকতে গিয়ে প্রশ্নকর্তা নিজেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিজিবিজি লেখার আশ্রয় নেন। এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার উচিত নিজে উত্তরগুলি পড়ে শোনানো। প্রশ্ন করা ও সম্পাদনার মাঝে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে প্রশ্নকর্তার পক্ষে নিজের লেখার অর্থ বের করাও কঠিন হয়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন করাই সবথেকে ভাল উপায়।

অসংগতি : কখনও কখনও উত্তরদাতার উত্তরগুলিতে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার প্রশ্নগুলিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হয়। সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে এই ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা যায়। নিরক্ষর উত্তরদাতারা মাঝে মাঝে অসংলগ্ন উত্তর দিয়ে থাকেন। এই সব ক্ষেত্রে উত্তরগুলির গঠন পরিবর্তন করার কোনওরকম প্রয়াস করা বাঞ্ছনীয় নয়।

সুষমতা : সুষমতা বলতে মূলত প্রশ্ন করা ও উত্তর নথিবদ্ধ করার পদ্ধতিগুলিকে বোঝায়। প্রশ্ন করার পদ্ধতি সুষম হওয়া খুবই জরুরী, কারণ এর উপরেই নির্ভর করে উত্তরের সুষমতা। উত্তরগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে প্রশ্ন করার পদ্ধতির মধ্যে পক্ষপাত বা প্রভেদগুলি টের পাওয়া সম্ভব হয়।

যেমন,

১. ধূমপান সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মত আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে ধূমপান করা ভাল, আবার কেউ কেউ একে ক্ষতিকর বলে মনে করেন। এই বিষয়ে আপনার মত কী?

২. আপনার কী মনে হয়না যে ধূমপান করা খারাপ?

প্রকৃত উত্তর জানতে হলে প্রথম প্রশ্নটিই করা উচিত। প্রশ্নকর্তা দ্বিতীয় প্রশ্নটি বেছে নিলে তার উত্তর

পক্ষপাতদুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরণের ত্রুটি এড়িয়ে চলতে প্রশ্নমালাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োনজন। প্রশ্নকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও নির্দেশ দিয়ে কোনও বড় ধরনের ত্রুটি সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব।

উত্তরদাতাদের আয়-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রেও সুষমতার সমস্যা দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর উত্তরদাতারা এর উত্তরে তাঁরা কতটা ফসল পান সেটাই উল্লেখ করেন, কিংবা তাঁদের দৈনিক, মাসিক বা বাৎসরিক মজুরির কথা জানান। উত্তরদাতারা মাপের সে সব এককের কথা উল্লেখ করেন সেগুলির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। এখানে প্রশ্নকর্তাকে নিজেই অঙ্ক করে বের করতে হয় উত্তরদাতার মাসিক, বা বাৎসরিক আয় কত। উত্তরদাতাদের দেওয়া উত্তরগুলিকে মূল কার্যালয়ে বসে ধীরেসুস্থে পরীক্ষা ও হিসাব করাই সবথেকে ভাল উপায়।

কোডিঙ (তথ্যকে সংখ্যাগত রূপ দেওয়া)

সম্পাদনার পরে প্রক্রিয়াকরণের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল কোডিঙ বা গুণগত তথ্যগুলিকে সংখ্যাগত রূপ দেওয়া। বিপুল পরিমাণ তথ্য নিয়ে কাজ করা এই পদ্ধতিতে অনেক সহজ হয়ে যায় এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ আরও দ্রুত ও সুমন্ধভাবে সম্পন্ন করা যায়।

যেসব সমীক্ষায় ফলাফলকে পরিমাণগত রূপে দেখানো প্রয়োজন হয়, সেই সব ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী একটি পর্যায় হল উত্তরগুলির কোডিঙ। কখনও কখনও একে এবং প্রাথমিক সম্পাদনাকে একই কর্মকাণ্ডের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

কোডিঙের উদ্দেশ্য হল কোনও একটি প্রশ্নের উত্তরগুলিকে অর্থপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজিত করা। এই পদ্ধতির দুটি স্বতন্ত্র পর্যায় আছে। প্রথমটি হল ব্যবহার করার শ্রেণীগুলিকে বেছে নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল উত্তরগুলিকে যথাযথ শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। শ্রেণীগুলির স্তবককে 'কোডিং ফ্রেম' বলে উল্লেখ করা হয়। প্রশ্নমালা থেকে সংগৃহীত সমস্ত তথ্যের সারাংসার যে সব কোডিঙ ফ্রেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেগুলির স্তবককে সাধারণত 'কোড বুক' বলা হয়।

কোডিঙ ফ্রেম : কোডিঙ ফ্রেম জড়িত থাকে কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের সঙ্গে। প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যা যদি খুবই কম হয়, তাহলে এই ফ্রেম গঠন করায় কোনও সমস্যা দেখা দেয় না। "আপনি কী আজ একটিও সিগারেট খেয়েছেন?" প্রশ্নটির উত্তর হতে পারে : "হ্যাঁ", "না", এবং এগুলির সঙ্গে থাকতে পারে "মনে করতে পারছি না", "উত্তর দেবনা", প্রযোজ্য নয়।" অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফ্রেম গঠন করাতে কোনও অসুবিধা হয় না কারণ তা নিজে থেকেই গঠিত হয়ে যায়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে ফ্রেম নিজে থেকেই গঠিত হয়না, সেখান বিচার করতে হয় কোডিঙে কতগুলি গোষ্ঠী বা গুচ্ছ থাকবে, যা আবার নির্ভর করবে উত্তরগুলির বন্টনের সম্ভাবনার উপর এবং কী ধরণের বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে তার উপর।

যেমন, উত্তরদাতা বাড়ীতে থাকলে কী ধরণের বাড়ীতে থাকেন?

সম্পূর্ণ খড় দিয়ে ছাওয়া বাড়ী ৫

আধা খড় দিয়ে ছাওয়া বাড়ী ৬

সম্পূর্ণ বারান্দা সমন্বিত বাড়ী ৭

স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বাড়ী ৮

অন্যান্য ৯

প্রযোজ্য নয় Y

এটা ধরে নেওয়া হয় যে এগুলি সমস্তত বিকল্প উত্তরের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের স্বতন্ত্র রাখা সুবিধাজনক। ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক কোডগুলিকে মিলিয়ে এক 'সম্পূর্ণ বাড়ী' কোডের আওতায় আনা যেত, কিন্তু এই তিনটির বিভাজনও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। মোটামুটি ভাবে এ কথা বলা হয় যে, কারণ পরে বিশ্লেষণের সময় এটিই উপযোগী প্রমাণিত হয়। আবার পাঞ্চড কার্ড বা কমপিউটার ব্যবহার করতে গেলে বেশী খুঁটিনাটি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। কোডিঙের মূল লক্ষ্য হল তথ্যের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া, কাজেই খুব বেশী বা খুব কম, দু ধরণের শ্রেণীবিভাজনই অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

উত্তরের কোডিঙ : উত্তরগুলিকে কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ উত্তরদাতাই করে ফেলতে পারেন, যখন প্রশ্নকর্তা প্রশ্নগুলির জন্য নির্দিষ্টভাবে বাছাই করা উত্তরের একগুচ্ছ তাঁকে সরবরাহ করেন। একই ঘটনা ঘটতে পারে অফিস কোড বা সরাসরি কোড সংবলিত প্রশ্নগুলির উত্তরের ক্ষেত্রেও প্রথম দুটি দৃষ্টান্তে আগে থেকে কোড দেওয়া প্রশ্ন সরবরাহ করা হয় এবং প্রশ্নকর্তাকে (ডাকে প্রশ্নমালা পাঠানোর ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে) শুধুমাত্র (স্রেফ টিক্ চিহ্ন দিতে বা উত্তরের নীচে রেকা টানার মত কাজ করতে হয়।

তৃতীয় ধরণের কোডিঙের প্রয়োজন হয় যখন কোনও উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব আক্ষরিকভাবে নথিবন্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে অফিস বা কার্যালয়ে কোডিঙ করা হয়। কোডিঙের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে দেখতে হয় উত্তরটি বিশেষ কোনও উপাদানের (যেমন সাধারণভাবে জীবন ধারণের ব্যয়) সঙ্গো প্রাসঙ্গিক কী না, অথবা প্রসঙ্গাটির গুরুত্ব বা উত্তরের বিভিন্ন বক্তব্য অনুযায়ী তাকে অনেকগুলির মধ্যে কোনও একটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

সারণিবন্ধকরণ

বেশীর ভাগ সমীক্ষাতেই সম্পাদনা ও কোডিঙ হয়ে যাবার পরবর্তী পর্যায়ে তথ্যকে কোনও ধরণের সারণিতে স্থাপন করা হয়। সারণিবন্ধ করার জন্য বিশেষ কোনও কৌশলের বা দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে মূল কাজ হল প্রতিটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে কতগুলি উত্তর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাই গণনা করা। সম্পাদনা ও কোডিঙের সাহায্যে তথ্যের অভ্রান্ততা ও যথার্থ শ্রেণীবিভাজনে সুনিশ্চিত করার পর বাকী থাকে সর্বসাকুল্যে কোনও প্রশ্নের উত্তর কত জন 'ক' কতজন 'খ' দিয়েছেন, তা গণনা করা।

যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই এই কাজ করা সম্ভব। হাতের সাহায্যে সারণি প্রস্তুত করা অতি সরল এবং কম শ্রমসাধ্য কাজ। কেউ যদি বৃত্তি অনুযায়ী আয়ের বন্টনের একটি বিশ্লেষণ চান তাহলে যা করা প্রয়োজন হল এই দুই পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির একটিকে অনুভূমিক এবং অন্যদিকে উল্লম্ব ভাবে উপস্থাপিত করা। স্বল্প আয়তনের সমীক্ষার জন্য যন্ত্রের সাহায্যে সারণিবন্ধকরণের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কোনও জটিল সমীক্ষার

ক্ষেত্রে, যেখানে পরিবর্তনশীল উপাদানের সংখ্যা দুইয়ের বেশী, সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে ছাড়া সারণিবন্ধ করণের কাজ কঠিন।

৩.০ তথ্যবিশ্লেষণ

গবেষণার সবকটি পর্যায়ের মধ্যে তথ্যবিশ্লেষণ সব থেকে বেশী দক্ষতা দাবী করে। এই কাজে গবেষকের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অন্য কারুর উপর দায়িত্ব না দিয়ে গবেষকের উচিত নিজেই এই কাজটি করা। যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় সমীক্ষার প্রেক্ষাপট ও তার প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। বিশ্লেষণের জন্য পরিমাণগত বা অন্য পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্য বিশ্লেষণের পদক্ষেপগুলি গবেষণার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। গবেষণার প্রারম্ভে যদি স্পষ্টভাবে সূত্রায়িত প্রকল্পের একটি গুচ্ছ থাকে, তাহলে প্রতিটি প্রকল্পকে তথ্যসম্পর্কে নেওয়া কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবার কাজ হিসাবে ভাবা যেতে পারে। প্রকল্প যত নির্দিষ্ট হবে, পদক্ষেপও তত নির্দিষ্ট হবে। এই ধরণের গবেষণায় বিশ্লেষণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে এক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়। তখন বিশ্লেষণের কাজ হয়ে দাঁড়ায় শুধু তথ্যের যথাযথ মিশ্রণটি সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে প্রকল্পগুলির সত্যতা ভ্রান্ততা যাচাই করার নির্দেশগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে নেওয়া।

বিশ্লেষণের অংশ হল সংখ্যাতাত্ত্বিক বন্টন নির্ণয় করা, নকশা প্রস্তুত করা, এবং গড়, শতকরা হার ইত্যাদি সহজ হিসাব করা. অর্থাৎ সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমীক্ষা বিশ্লেষণের এক অঙ্গ। অনেকগুলি আংশিক পরিবর্তনশীল উপাদানের সম্পর্কে স্থাপন ও ব্যাখ্যার তাগিদেই সমীক্ষাতে জটিল সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশ্লেষণের অর্থ প্রকল্পগুলি যাচাই করা। আদর্শ পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ তেমন সমস্যার মুখোমুখ হয় না, কারণ প্রকল্পের বক্তব্য ও পরীক্ষামূলক নকশার বিশদীকরণ নিজে থেকেই বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে।

তথ্য বিশ্লেষণ যে সমস্যাগুলি সৃষ্টি করে সেগুলি প্রত্যেকটিই প্রকল্প বা প্রকল্পগুলির জটিলতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবশ্য দুটি দিক আছে, যার ফলে এই ধরণের আদর্শ পরিস্থিতি সব সময় পাওয়া যায়না। এদের প্রথমটি হল সংগতিহীন পরীক্ষালব্ধ সুষমতার উপস্থিতি ও দ্বিতীয়টি হল আশানুরূপ সুষমতার অনুপস্থিতি। এই সব ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক নকশা অনুসরণ করে বিশ্লেষণের কাজটি করা সম্ভব হয় না এবং অন্য পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে এক উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যকে অন্য সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করার। দুটিকেই আমরা আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণ বলতে পারি। পরীক্ষানিরীক্ষার অতি 'বিশুদ্ধ' দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই ধরণের বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলিকে 'আপাত-সমীচীন' (plausible) বলা গেলেও বিজ্ঞানের ভাষায় 'সম্ভাব্য' (probable) বলা যায় না। তা সত্ত্বেও আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণ শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগীও।

বিশ্লেষণ সম্পর্কে দুই ধরণের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে একটি তথ্য উপস্থাপনার পদ্ধতি

নিয়ে এবং অন্যটি তাদের যুক্তিসঙ্গত বিন্যাসের পদ্ধতি নিয়ে, যার মাধ্যমে প্রশ্ন করা ও উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে।

৩.১ সংখ্যাতাত্ত্বিক উপস্থাপনা

গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনার সহজতম পদ্ধতি হল সারণিবদ্ধকরণ। এর মূল উপাদান হল ফলাফলের সংক্ষিপ্তসারকে সংখ্যাতাত্ত্বিক সারণির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা। এর অর্থ হল একটি স্তম্ভে কোনও পরিবর্তনশীল উপাদানের বিভিন্ন মান অর্ন্তভুক্ত করা এবং অন্য একটি স্তম্ভে প্রতিটির পুনরাবৃত্তির হারকে অর্ন্তভুক্ত করা। একটি উপযোগী বারংবারতা বন্টন (frequency distribution) বা সরল সারণি প্রস্তুত করতে একমাত্র যে সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে সেগুলি তিনটি বিষয়ে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করার সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রথমত, বাঁ দিকের স্তম্ভটিতে যে সব বৈশিষ্ট্য বা মান অর্ন্তভুক্ত করা হবে সেগুলি পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র হতে হবে। একই সঙ্গে সেগুলিকে এমন হতে হবে যে, বিপুল পরিমাণ পর্যবেক্ষণও যেন তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলির সমাপতন বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সারণিবন্ধকরণের অভ্যন্তরীণ যুক্তি ও বিন্যাস থাকতে হবে। গুণগত ক্ষেত্রে বিন্যাস ততটা জরুরী না হলেও যুক্তির গুরুত্ব অপরিহার্য। সারণিবদ্ধকরণের সবকটি ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কাঠামো না থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এক বিন্যাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যাকে এক বিশ্লেষণী নীতি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, বাঁ দিকের স্তম্ভে যদি কোনও পরিমাণগত পরিবর্তনশীল উপাদান রাখা হয়, তাহলে শ্রেণী ব্যবধান (class interval) নির্বাচনে সতর্ক থাকা উচিত। তথ্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষিত বিষয়গুলির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীব্যবধান স্থির করা বাঞ্ছনীয়। তথ্যকে যথার্থভাবে বোঝার জন্য স্বতন্ত্র উপাদানগুলিকে মানের উর্দ্ধমুখী বা নিম্নমুখী বিন্যাসে উপস্থাপিত করা হয়।

সাধারণভাবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, বিশ্লেষণের সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে সুপটু হস্তচালনার থেকে বড় ভূমিকা নেয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রয়োগ। গবেষণার নকশা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সঙ্গে যিনি সম্যক্‌ভাবে পরিচিত, সেই গবেষকের কাছে তাঁর তথ্যবিশ্লেষণ সেরকম সমস্যার সৃষ্টি করবে না।

৪.০ রিপোর্ট রচনা

গবেষণার রিপোর্ট লেখা বলতে বোঝায় কৃত গবেষণার সবকটি দিককে লিখিত ভাবে প্রকাশ করা। কোনও গবেষণা রিপোর্ট ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। রিপোর্টের মাধ্যমেই কোনও গবেষণার উৎকর্ষ সম্পর্কে মানুষ জানতে পারেন।

গবেষণা রিপোর্টের কাঠামো সচরাচর মনোগ্রাফের (একটি বা এক শ্রেণীর বিষয়ের উপর লিখিত নিবন্ধ)

কাঠামোর মত হয়ে থাকে। এ কথা তত্ত্বগত (academic) গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, যেখানে রিপোর্ট যথেষ্ট দীর্ঘ হয় এবং তাকে গবেষণাপত্র (thesis) বলা হয়।

রিপোর্টের কাঠামোকে সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। এই প্রধান ভাগগুলিকে আবার আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা যায়।

I. প্রাক-পত্র (preliminaries)

১. নামপত্র (title page)
২. মুখবন্ধ ও স্বীকৃতি (preface and acknowledgement)
৩. বিষয়সূচি (table of contents)
সারণি ও নকশার তালিকা
সংক্ষেপণের (abbreviation) তালিকা
শব্দপঞ্জী (glossary)
সংযোজনের তালিকা

II. রিপোর্টের মূল অংশ

ভূমিকা (যদি প্রয়োজন হয়)
৪. মূল পাঠ্যাংশ ও প্রামাণ্য তথ্য

III. শেষাংশ

৫. সংযোজন
৬. গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ নামপত্র

নাম পত্রের উপরে থাকে গবেষণার শিরোনাম ও মাঝে গবেষকের নাম। গবেষকের নাম থাকে এই ক্রমে—নাম, মধ্য নাম (যদি থেকে থাকে) ও পদবি এবং পূর্বে সংগৃহীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্থাৎ ডিগ্রী। এর নীচে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে থাকে উপরি-লেখ (Superscription) : "ডক্টর অফ ফিলজফি ডিগ্রীর জন্য (বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাপত্র জমা দেওয়া হল।" শেষে পাতার একদম নীচের দিকে জায়গার নাম ও তার নীচে গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার বছর।

নাম পত্রের নমুনা :

MODERN POETIC DRAMA
with special reference to
W. B. YEATS
BY
ADITYA KUMAR OHDEDAR, M.A.
THESIS SUBMITTE TO THE
BENARES HINDU UNIVERSITY, BENARES
FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY
BENARES
1952

নাম পত্রের নমুনা

কামরূপী উপভাষা :
স্থানীয় রূপসমূহের এক
তুলনামূলক অধ্যয়ন

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার
অন্তর্গত পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর
জন্য প্রদত্ত গবেষণা গ্রন্থ

বিভা ভরালী
অসমীয়া বিভাগ
গৌহাটী, আসাম
১৯৯৮

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

৪.২ মুখবন্ধ ও স্বীকৃতি

একই বিষয়ে যদি পূর্বে গবেষণা হয়ে থাকে, তাহলে মুখবন্ধে সেগুলির একটি পর্যালোচনা থাকা উচিত যা থেকে সেগুলির সঙ্গো মতানৈক্য বা মতভেদগুলি স্পষ্ট হয়। বোঝা যায় আগের গবেষণাগুলির স্ববিরোধ ও অক্ষমতাগুলি কাটিয়ে কীভাবে বর্তমান গবেষণাটি উঠে এসেছে। গবেষণাতে নতুন কোনও দিশা উন্মুক্ত হলে বিশেষভাবে সেটির উল্লেখ করা উচিত যাতে গবেষণার গুরুত্ব ও জ্ঞানের জগতে সেটির অবদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গবেষণার সীমারেখার কথা বা কাজটি সম্পাদন করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

মুখবন্ধের শেষে স্বীকৃতিকে স্থান দেওয়া যেতে পারে, যদিও ইচ্ছা হলে তাকে স্বতন্ত্রভাবেও রাখা যায়।

৪.৩ বিষয়সূচী

বিষয়সূচীতে রিপোর্টের প্রধান অংশগুলির উল্লেখ থাকতে হবে : ১) ভূমিকা, ২) পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় এবং তাদের উপ-পরিচ্ছেদগুলি, ৩) সংক্ষেপণ ও শব্দপঞ্জী, ৪) সংযোজন। এগুলির প্রতিটি কোন কোন পাতায় আছে তা উল্লেখ করতে হবে। পাঠ্যাংশের ভিতর পরিচ্ছেদ ও তার শাখাগুলির উল্লেখ থাকলে সেগুলি যেন বিষয়সূচীতে দেওয়া নামগুলির সাথে মিলে যায়।

বিষয়সূচীর উদ্দেশ্য হল পাঠককে রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া এবং দ্রুত সেগুলি খুঁজে নিতে তাঁকে সাহায্য করা।

৪.৪ রিপোর্টের মূল পাঠ্যাংশ

এটিই গবেষণা রিপোর্টের প্রধান অংশ। এতেই অর্ন্তভুক্ত থাকে তথ্যের সংগঠন, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং একই সঙ্গো সংক্ষিপ্তসার ও উপসংহার।

মুখবন্ধে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া থাকলে এখানে পৃথক কোনও ভূমিকার প্রয়োজন নেই। মুখবন্ধ না থাকলে ভূমিকা অবশ্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আবার গবেষণার গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে মুখবন্ধে ভালভাবে উল্লেখ না করা হলে সেগুলির বিস্তারিত পরিচয় দেবার জন্যও ভূমিকার প্রয়োজন হয়। সংক্ষেপে বললে, মুখবন্ধ ও ভূমিকা দুই-ই থাকলে একে অপরের পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঠ্যাংশ হওয়া উচিত এমন এক আখ্যানের মত, যা প্রথম থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এক সূত্রে গ্রথিত। অধ্যায়গুলির সমাপতন বাঞ্ছনীয় না হলেও একটি অধ্যায় যেন তার পরেরটির সঙ্গো সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে যাতে দুটির মধ্যে কোনও ধরণের অসম্বন্ধতা লক্ষ্য না করা যায়।

ডকুমেন্টেশন : এই অংশ থাকে পাদটীকা, যার মূল উদ্দেশ্য হল কোনও বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা বা বৈধতা দেওয়া।

সংযোজন

এই অংশে যাকে কিছু প্রাসঙ্গিক সহায়ক উপাদান, যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও মূল পাঠ্যাংশের পক্ষে অপরিহার্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনও সমাজ-গবেষণা বা সমীক্ষায় এই অংশে থাকে প্রশ্নমালা, অসংশোধিত তথ্য ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী

গবেষক তাঁর কাজে যে সব উৎস বা উপাদানের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, শেষে থাকা এই অংশে সেগুলির উল্লেখ থাকে। এগুলির সংখ্যা বেশী হলে গ্রন্থপঞ্জীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিলে সুবিধা হয়। ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জীতে প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক উৎসগুলিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়।

রচনাশৈলী

ম্যাথু আর্নল্ড (১৮২২-১৮৮৮) বলেছিলেন, "যদি কিছু বলার থাকে তাহলে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তা বলুন। শৈলীর প্রকৃতরহস্য সেটাই।" বার্নার্ড শ বলেছিলেন, "প্রথমেই তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিন—সব রকমের শৈলীর ভিত্তি সেটাই।" আবার জোনাথান সুইফ্‌ট "যথাযথ স্থানে যথাযথ শব্দকে" উত্তম শৈলীর মানদণ্ড হিসাবে দেখেছিলেন। রিপোর্ট রচনা স্পষ্ট হলে তার উপস্থাপনা যুক্তিনির্ভর, সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

রচনা স্পষ্ট হবার এক প্রয়োজনীয় শর্ত হল সাধারণ, পরিচিত শব্দের ব্যবহার এবং সরল বাক্য গঠন। বিমূর্ত শব্দ এড়িয়ে নির্দিষ্ট অর্থবাহী শব্দ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয় এবং ঘুরিয়ে কথা না বলে ছোট ছোট শব্দের মাধ্যমে সোজাসুজি বক্তব্য পেশ করা কাম্য। অশিষ্ট বা ইতর শব্দের ব্যবহার কোনও অবস্থাতেই উচিত নয়। সাধারণত কর্তৃবাচ্যে বাক্য গঠন করা হলেও, ব্যক্তিগত সর্বনাম, যেমন আমি, আপনারা, আমরা ইত্যাদি এড়িয়ে চলার জন্য কর্মবাচ্যে বাক্য গঠন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "আমি দশটি ছাত্রের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম" লেখার স্থানে লেখা উচিত "দশটি ছাত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল।" সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা উচিত বলার অর্থ এই যে গবেষকের উচিত কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত শব্দ, অস্পষ্ট শব্দ, বিদেশী শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, আনকোরা নতুন শব্দ ইত্যাদি প্রয়োগ না করা।

গবেষকের উচিত কর্তার সঙ্গো ক্রিয়ার সামঞ্জস্য, সম্বন্ধবাচক অব্যয়ের সঠিক প্রয়োগ এবং শব্দবিন্যাসের উপর সতর্ক নজর দেওয়া। এটা লক্ষ্য করা যায় যে সম্বন্ধবাচক অব্যয় প্রায়শই ভুল ভাবে প্রয়োগ করা হয়। শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, গুণবাচক শব্দ, বাক্যাংশগুলিকে তারা যে শব্দগুলির প্রসঙ্গো ব্যবহৃত হয়েছে তাদের যথাসম্ভব কাছাকাছি স্থাপন করা দরকার। ভুল শব্দবিন্যাস কোনও বাক্যকে অস্পষ্ট, এমনকী অর্থহীন করেও তুলতে পারে।

উৎস থেকে উদ্ধৃতি

রিপোর্ট লেখার সময় গবেষককে কখনও কখনও বিভিন্ন সূত্র বা দলিল থেকে উদ্ধৃতি দিতে হয়। গবেষকের কোনও বক্তব্যকে সমর্থন করতে বা কোনও বক্তব্যকে আরও জোরালো করতে বা নিছক ঋণ স্বীকার করার

উদ্দেশ্যে এই উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োজন হয়। আবার কোনও গবেষক যদি কোনও আইন বা আঙ্গিক সূত্র বা ধারণাকে মূল লেখকের মত স্পষ্ট বা সাবলীল ভাষায় পূনর্লিখন করতে সক্ষম হন, সেক্ষেত্রে তিনি বিনা দ্বিধায় উদ্ধৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উদ্দেশ্য যাই হোক, উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত এবং তা যেন মূল পাঠ্যাংশের সঙ্গো ভালভাবে মিশে যায়।

উদ্ধৃতির পদ্ধতি : কোনও উদ্ধৃতির প্রথমে ও শেষে দুটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়। উদ্ধৃতির ভিতরে আরও একটি উদ্ধৃতি থাকলে তার প্রথমে ও শেষে একটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়। একক উদ্ধৃতি চিহ্নটি বাক্যের শেষে এসে পড়লে একটু জায়গা ছেড়ে দুটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়।

দীর্ঘ কোনও উদ্ধৃতিকে ছোট হরফে (মুদ্রিত পৃষ্ঠায়) বা এক লাইন জায়গা ছেড়ে (টাইপ করা পাণ্ডুলিপিতে) ছেড়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন দেবার প্রয়োজন হয় না।

উহ্যপদ (ellipses) : তাঁর বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক না হলে কোনও কোনও সময় গবেষক কোনও উদ্ধৃতি দেবার সময় কিছু কিছু শব্দ, শব্দগুচ্ছ এমনকী বাক্যও বাদ দিয়ে দেন। এই বাদ দেওয়াকে তিনটি বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। বাক্যের শেষে কিছু বাদ দেওয়া হলে চতুর্থ একটি বিন্দু ব্যবহার করা হয় যা পূর্ণচ্ছেদের কাজ করে। বোধগম্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কোনও শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যোগ করলে সেগুলিকে বর্গ-বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়।

উদ্ধৃত পুস্তক বা পত্রিকার নামের নীচে রেখা দেওয়া হয় এবং কোনও পুস্তকের অর্ন্তগত প্রবন্ধ ইত্যাদির নামের প্রথমে ও শেষে দুটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া হয়।

বিশ্বস্ততা : প্রতিটি উদ্ধৃতি অবিকৃত হওয়া উচিত। এর অর্থ মূল রচনার প্রতিটি শব্দ, বানান, বিরামচিহ্নকে উদ্ধৃতিতে একই রকম ভাবে রাখা উচিত। অবশ্য প্রাচীন পাঠ্যাংশের আধুনিকীকরণের সময় কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে রিপোর্টের কোনও একস্থানে এই প্রসঙ্গো জানিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

লিপ্যন্তর (transliteration)

সংস্কৃত বা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার পাঠ্যাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিলে রোমান লিপিতে লিপ্যন্তর করে নেওয়া উচিত যার জন্য ধ্বনি নির্দেশক সংকেতচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। দেবনাগরী থেকে রোমানে লিপ্যন্তরের উদাহরণ :

y fU = C

a ka tha bha

ডকুমেন্টেশন

'ডকুমেন্টেশন' শব্দটি গ্রন্থাগারবিজ্ঞান, তথ্যবিজ্ঞান এবং গবেষণাতেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওয়েবস্টারের 'থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি' উদ্ধৃত করলে গবেষণার ক্ষেত্রে এর অর্থ "কোনও রচনার মধ্যে তথ্য বা তত্ত্বের সমর্থনে প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসাবে পাদটীকা সংযোজনের সংস্থান।"

পাদটীকা : পাদটীকা দুই ধরণের হয়। এদের মধ্যে একটি হল বিষয় বা ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা যা আরও তথ্যের সাহায্যে কোনও বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে। এই ধরণের পাদটীকা আবার প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে রিপোর্টের মূল পাঠ্যাংশে উল্লিখিত কোনও ব্যক্তি, স্থান বা বস্তুকে চিহ্নিত করে। এর ফলে তা এক পাঠ করার বিষয় হয়ে ওঠে। এই ধরণের পাদটীকার প্রয়োজন আছে কারণ মূল পাঠ্যাংশে কোনও বক্তব্য বা ঘটনার বিশদীকরণ করলে তা অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ মনে হতে পারে বা আখ্যানের সুত্রটি ছিন্ন করতে পারে যা পাঠকের মনোযোগ বিচ্যুত করতে পারে।

অন্য ধরণের পাদটীকাটি হল তথ্যমূলক বা রেফারেন্স পাদটীকা।

এই ধরণের পাদটীকাতে রিপোর্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত কোনও বক্তব্য বা উদ্ধৃতির সূত্র বা প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রথম ধরণের পাদটীকাটি অপরিহার্য নয়। এটিকে বাদ দিয়েও গবেষণা রিপোর্ট লেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের পাদটীকাটিকে বাদ দেওয়া সহজ নয়। নাম থেকেই এটা বোঝা যায় যে পাদটীকা থাকে পৃষ্ঠার পাদদেশে। এতে পাঠকের সুবিধা হলেও টাইপ করা বা ছাপার সময় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণে এখন বিকল্প হিসাবে 'এণ্ড-নোটের' ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এণ্ড-নোট বলতে এক ধরণের পাদটীকাকেই বোঝায়, যা একসঙ্গে পৃথক একটি পৃষ্ঠায় প্রতিটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের নীচে দেওয়া হয়। কোনও ব্যাখ্যামূলক টীকা না থাকলে এর শীর্ষনাম হিসাবে "টীকা ও রেফারেন্স" বা শুধুমাত্র "রেফারেন্স" ব্যবহার করা হয়।

তথ্যমূলক পাদটীকার উদ্দেশ্য

তথ্যমূলক পাদটীকার উদ্দেশ্য হল তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এটা দেখানো যে, রিপোর্টের রচয়িতা বৌদ্ধিক ভাবে সৎ এবং সেই কারণে যে সব সূত্র বা উৎস থেকে তিনি তথ্য বা ভাবনা আহরণ করেছেন তাদের প্রতি ঋণ স্বীকার করা। এর আরও একটি উদ্দেশ্য হল বিস্তারিত বিবরণ বা ব্যবহৃত উপাদানগুলির প্রামাণিকতার জন্য যে সূত্রগুলি দেখা প্রয়োজন সেগুলিকে নির্দেশ করা। এছাড়া, এই পদটীকা গবেষণার বিষয়টির এক বৃহত্তর পটভূমি পাঠকের কাছে তুলে ধরার কাজ করে।

তথ্যমূলক পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জী

তথ্যমূলক পাদটীকা শুধু সেই নথি বা দলিলগুলির উল্লেখ করে যেগুলি থেকে রিপোর্টে ব্যবহার করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জী এগুলি ছাড়াও আরও কিছু প্রাসঙ্গিক নথির উল্লেখ করে, গবেষক যেগুলির

পরামর্শ নিয়েছেন অথচ রিপোর্টে সেগুলি থেকে কোনও অংশ তুলে দেননি। এছাড়া, গ্রন্থপঞ্জীর উদ্দেশ্য হল লেখক, শীর্ষনাম, সংস্করণ ও মুদ্রণের মাধ্যমে কোনও নথিকে চিহ্নিত করা। নীচের উদাহরণটি ভালভাবে লক্ষ্য করলেই দুইয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে।

তথ্যমূলক পাদটীকা : Joseph Hone, *W.B. Yeats : 1865-1938*
(London : Macmillan, 1965), p. 108

গ্রন্থপঞ্জী : Hone, Joseph. *W. B. Yeats : 1865-1938.*
London : Macmillan, 1965.

উদ্ধৃতির (Citation) শৈলী

তথ্যমূলক পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জী, দুটিই কোনও প্রামাণ্য শৈলীতে প্রস্তুত করা দরকার। উদ্ধৃতির বিভিন্ন শৈলী আছে যাদের মধ্যে এগুলির নাম করা যেতে পারে : ১) IS : 2381-1963 Recommendations for Bibliographical Reference, ২) Anglo-American Cataloguing Rules, ৩) The Chicago Manual of Style ৪) MLA Handbook for Writers of Research Papers.

এদের মধ্যে যে কোনও একটি শৈলীকে অনুসরণ করা যেতে পারে, কিন্তু যেটিকেই করা হোক, সেটিকে সমগ্র রিপোর্ট জুড়ে টানা মেলে চলতে হবে। শৈলীতে কোনও পরিবর্তন ঘটালে সেই পরিবর্তনকেও টানা অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যা কাম্য তা হল সংগতি। এই আলোচনাতে আমরা MLA শৈলী ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগে তথ্যমূলক পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জীর প্রভেদ বোঝানোর সময়েও এটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্যমূলক পাদটীকার উদ্ধৃতি

পাদটীকাকে যাতে টানা একটি বাক্যের মত পড়া যায়, সেই কারণে অভ্যন্তরীণ পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন ব্যবহার না করে প্রকাশনার স্থান, প্রকাশক এবং প্রকাশনের সময়কে বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করা হয়।

পাদটীকার সংখ্যা : পাদটীকার সংখ্যা হল পাঠ্যাংশের কোনও লাইন বা পাদটীকার উদ্ধৃতির উপরে সব বিরামচিহ্নের শেষে দেওয়া সংখ্যা। নামের নীচে রেখা দেওয়া : গবেষণা রিপোর্টে থাকা যে কোনও গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম ও উপনামের নীচে রেখা দেওয়া উচিত, অর্থাৎ সেগুলিকে 'আন্ডারলাইন' করা উচিত।

নিবন্ধের উদ্ধৃতি

কোনও পত্রিকার নিবন্ধের উদ্ধৃতিতে থাকা উচিত, ১) লেখকের নাম, ২) নিবন্ধের শীর্ষনাম (দুটি করে উদ্ধৃতি চিহ্নের মাঝখানে), ৩) 'আন্ডারলাইন' করে পত্রিকার নাম ও ৪) অন্যান্য নির্দিষ্ট তথ্য ও পৃষ্ঠার নম্বর।

৪.৫ উপসংহার

গবেষণা রিপোর্ট লেখার জন্য যথেষ্ট পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি আবশ্যক। এছাড়া, ধারাবাহিক চিন্তা এবং সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত রচনাই গবেষণা রিপোর্টকে ত্রুটিহীন করে তুলতে পারে। রিপোর্ট রচনার জন্য প্রয়োজন হয় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা, প্রয়াস, ধৈর্য, বিষয়টি সম্পর্কে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্য ও তার বিশ্লেষণ এবং ভাষার উপর যথেষ্ট দখল ও নিরপেক্ষতা। সাধারণ মানুষের জন্য রিপোর্ট রচনা করলে সেটি সরল, আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত। আবার বিশেষ কোনও গোষ্ঠী, যেমন প্রশাসক শ্রেণীর জন্য রচিত রিপোর্টের চরিত্র ততটা সাধারণ বা অত্যন্ত প্রকরণগতও হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

রিপোর্ট রচনার সময় গবেষকের উচিত সর্বদা তাঁর নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। উত্তরদাতার পরিচয় গোপন রাখার আশ্বাস দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কোনও তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করলে গবেষকের উচিত সেই গোপনীয়তাকে রক্ষা করা। এছাড়া গবেষকের লক্ষ্য রাখা উচিত সেই গোপনীয়তাকে রক্ষা করা। এছাড়া গবেষকের লক্ষ্য রাখা উচিত যে রিপোর্টে প্রদত্ত সব তথ্যই যেন ত্রুটিহীন, পক্ষপাতশূন্য ও অবিকৃত হয়। কোনও গবেষণা রিপোর্টের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এর বিষয়বস্তুকে সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কাজেই রচনা স্বচ্ছ বা প্রাঞ্জল না হলে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজ নয়। রিপোর্ট রচনার সময়ে একথা মনে রেখে গবেষকের অগ্রসর হওয়া উচিত।

৫.০ গবেষণা-প্রস্তাব সূত্রবন্ধ করার জন্য ICSSR নির্দেশিকা

কোনও গবেষণা-প্রস্তাব আসলে এক ধরণের বিশদ পরিকল্পনা। ICSSR-কে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা করা ছাড়াও যে কোনও সুচিন্তিত গবেষণা প্রস্তাব পরবর্তীকালে তার রূপায়ণেও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। সুতরাং কোনও যথাযথ গবেষণা-প্রস্তাব সূত্রায়িত করার প্রতিটি প্রচেষ্টাই সুফল দিতে পারে।

সাহিত্য এবং সমাজবিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ, পদ্ধতিগত কৌশল, তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয় জড়িয়ে থাকে। কাজেই এই স্বল্প পরিসরে কোনও গবেষণা প্রস্তাবের সব দিকগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি সব ধরণের গবেষণা প্রস্তাবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১) গবেষণার জন্য কোনও সমস্যা বা বিষয়কে সূত্রবন্ধ করা ;

২) প্রস্তাবিত গবেষণার সীমা নির্দ্ধারণ করা এবং স্বয়ংস্বতন্ত্র অংশগুলির বিশদীকরণ করা ;

৩) তথ্য সংগ্রহের সূত্র ও পদ্ধতি ; এবং

৪) তথ্য বিশ্লেষণ।

কোনও গবেষণাযোগ্য সমস্যা নির্বাচন নির্ভর করে গবেষকের ঝোঁক, প্রশিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর। সমস্যাটি যাই হোক না কেন—অবশ্য সেটি গবেষণাযোগ্য হতেই হবে—কোনও নির্দিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় নিয়ে

প্রায়শই চিন্তা করতে হয় : সামাজিক বাস্তবকে জানা এবং/অথবা তার নির্দিষ্ট দিক বা দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করা। এই দুটির মধ্যে কোনটি কাউকে উদ্দীপিত করছে, তা গবেষণা প্রস্তাবটির বিকাশ ও নকশার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। প্রথম লক্ষ্যটির জন্য প্রয়োজন হয় গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে মনে করা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিচারে সামাজিক বাস্তবের একটি অংশবিশেষ সম্বন্ধে ছক করা। অন্য দিকে লক্ষ্য যদি হয় বিশেষ কোনও সামাজিক ঘটনা ঘটনার ব্যাখ্যা করা, তাহলে জোর দেওয়া হয় ওই বিশেষ ঘটনাটি কেন ঘটে এবং কারণগত অথবা অনুষঙ্গবাদী নিরিখে কী কী বিষয়ের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করা যায় তার উপর। কাজেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই দুই ধরণের গবেষণার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কৌশলের প্রয়োজন হয়।

গবেষণার লক্ষ্য যাই হোক না কেন, এটা বোঝা যায় যে সামাজিক বাস্তবের কোনও নির্দিষ্ট দিক নিয়ে ছক করা অথবা কোনও ঘটনা ঘটার ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে জরুরী বৈশিষ্ট্যগুলি নির্বাচনের জন্য সমস্যা ও তার বিভিন্ন দিকগুলিকে এক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা আবশ্যক। এই পরিপ্রেক্ষিত যোগাতে পারে এক দিকে সমাজ বিজ্ঞানের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে সমস্যা সম্পর্কে নেওয়া তাত্ত্বিক অবস্থান। কাজেই কোনও যথার্থ গবেষণার নকশা তৈরির শুরুতে এক গবেষণাযোগ্য সমস্যাকে সূত্রবন্ধ করা এবং পরে একে কোনও তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করে সেই বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং অনুসন্ধানের বিষয়টি সম্পর্কে প্রকাশনাগুলির সঙ্গো সাধারণভাবে পরিচিত হওয়া গবেষণার নকশা তৈরির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এর উদ্দেশ্য সবকটি প্রকাশিত রচনার কে তালিকা প্রস্তুত করা নয়। এর লক্ষ্য হল প্রস্তাবিত গবেষণার পক্ষে উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিষয়গুলিকে বেছে নেওয়া। এই বেছে নেওয়া একদিকে যেমন সমস্যাটির বিশিষ্টতা নির্ণয় করে, তেমন অন্য দিকে গবেষণার বিষয়টির তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতকে আলোকিত করে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতের স্পষ্ট রেখাগুলি এবং প্রকাশিত রচনাগুলি পর্যালোচনার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক আছে। হাতে নেওয়া সমস্যাটি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নির্বাচিত রচনাগুলি প্রাসঙ্গিক বা যথেষ্ট হবে কী না, সেই বিষয়ে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত সহায়তা করতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে আসবে, সেটি ব্যক্তিগত নির্বাচনের ব্যাপার।

বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক, গবেষণা যে ধরণেরই হোক না কেন, অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত সমস্যাটি অনিবার্যভাবে এক জটিল ও বহুমুখী সামাজিক বাস্তবের মধ্যে নিহিত থাকে। এই কারণে সেই বিশেষ সমস্যাটির পক্ষে প্রাসঙ্গিক সামাজিক বাস্তবের দিকগুলি ইঙ্গিত করার প্রয়োজন হয়। যে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতটি গ্রহণ করা হয়েছে সেটিই কোন কোন দিক নির্বাচন করা হবে তা নির্ণয় করে। এ গবেষণার সীমাও নির্ধারণ করে এবং অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকৃতি সুনিশ্চিত করার ভিত্তি প্রদান করে।

গবেষণা উদ্যমের দিকগুলি নির্ণয় করা সচরাচর সামাজিক বাস্তবের নির্দিষ্ট চিন্তার ক্ষেত্রের সঙ্গো সম্পর্কিত ধারণাগুলির ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এখানে যেহেতু একটি ধারণা বা চিন্তার ক্ষেত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গো পরীক্ষালব্ধ সত্যের সংযুক্তি ঘটায়, সেহেতু কোনও গবেষণা প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে এমন ধারণা বা চিন্তার ক্ষেত্রগুলির স্পষ্ট ও নিখুঁত সংজ্ঞা নিরূপণ করা জরুরী। এছাড়া, ভাবনা ও চিন্তার ক্ষেত্রগুলি ক্রিয়াশীল করা প্রয়োজন যাতে ভাবনাগুলি ও তাদের পরীক্ষালব্ধ নিদর্শনগুলির মধ্যেকার পথ সহজ ও বৈজ্ঞানিক বিচারে

স্বীকার্য হয়।

বর্ণনামূলক গবেষণার নকশার ক্ষেত্রে দিকগুলি বর্ণনা ও তাদের ক্রিয়াশীল করার বেশী কিছু প্রয়োজন না হলেও ব্যাখ্যামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে আরও অতিরিক্ত তথ্যের দরকার হয়, যেমন ব্যাখ্যামূলক কাজটি কীভাবে সম্পাদন করা হবে। একে প্রথমেই সেই বিষয়গুলির দিকে ইঙ্গিত করতে হবে যাদের সাহায্যে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হবে এবং দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির মধ্যে প্রকাশিত সম্পর্কগুলির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। অন্যভাবে প্রকাশ করলে, প্রস্তাবে এমন এক ব্যাখ্যামূলক মডেল থাকবে যাতে কোনও না কোনও ধরণের আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

গবেষণার নকশা তৈরির পরবর্তী পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কী ধরণের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করা, কী পদ্ধতিতে এই সংগ্রহের কাজ করা হবে তা নির্ণয় করা এবং একক হিসাবে কী ধরা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সমস্যার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলি থেকে একেবারে তৈরি (ready made) তথ্য পাওয়া যেতে পারে অথবা তথ্য সৃষ্টি করতে হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎসের উল্লেখ করা আবশ্যক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু উপকরণ, যেমন প্রশ্নমালা ইত্যাদি গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ বা সংবাদদাতাকে কাজে লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। সে যাই হোক, কী প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা উল্লেখ করা আবশ্যক। এছাড়া ব্যক্তি, সমষ্টি বা অন্য কিছু—যাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সেই 'এককটির' উল্লেখ থাকা উচিত।

অনেক সময় কাম্য হলেও কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার সবকটি দিক বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। সময় ও সংগতির সীমাবদ্ধতা কয়েকটি মাত্র দিক বেছে নিতে বাধ্য করে যাদের সমগ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি মনে করা হয়। এই কারণে কোনও কোনও ধরণের গবেষণার নকশায় নমুনা নির্বাচন বা স্যাম্পলিঙ পদ্ধতি ও স্যাম্পলের আয়তন বা বহর ও সেগুলি নির্বাচনের কারণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেখানে অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু মাত্র একটি 'ইউনিট', সেখানে ওই বিশেষ ইউনিট-টিকেই যে কেন বেছে নেওয়া হল প্রস্তাবে তার উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে গেলে তাকে এমনভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে যাতে কোনও বিশ্লেষণের পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ সহজ হয়ে ওঠে। একথা মনে রাখা উচিত যে উদ্দেশ্য পূর্ণ হলেই সেই উদ্দেশ্যের জন্য সংগৃহীত তথ্যের মূল্য ফুরিয়ে যায় না। আনুষঙ্গিক বিশ্লেষণের জন্য অন্য গবেষকরা তা ব্যবহার করতে পারেন। সঠিকভাবে বলতে গেলে তথ্য নথিবদ্ধ করার সময় তার পুনর্ব্যবহারের সংস্থান রাখা উচিত। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য পরিমাণগত তথ্যের ক্ষেত্রে, যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে নথিবদ্ধ তথ্যকে সহজেই পূনর্বিশ্লেষণের কাজে লাগানো যায়। প্রস্তাবে এরও সংস্থান থাকা উচিত এবং তথ্য কীভাবে বিশ্লেষণ করা হবে সেই সম্পর্কে উল্লেখ থাকা উচিত। বিশেষত ব্যাখ্যামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে কোডিঙের নকশা, বিভিন্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ ইত্যাদি সমেত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা গবেষণার নকশার অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, কোনও যথার্থ গবেষণার নকশা গঠন নীচের নির্দেশিকা অনুসারে করা বাঞ্ছনীয় :

I. প্রকল্পের শীর্ষনাম

II. সমস্যার পরিচয়

গবেষণা প্রস্তাবের প্রথম পরিচ্ছেদেই যে সমস্যাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হচ্ছে তার স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি এবং আলোচিত বিষয়টির তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে সমস্যাটির অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে হবে। বিষয় বা সমস্যাটির গুরুত্ব, এই প্রস্তাবিত গবেষণা তত্ত্ব, পদ্ধতিবিদ্যা, এরং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কতখানি অবদান রাখতে পারবে এবং এই অনুসন্ধানের জাতীয় তাৎপর্যকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

III. প্রকাশিত রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিতি

এই ক্ষেত্রে গবেষণার বর্তমান অবস্থান (গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা ফলাফলগুলি অর্ন্তভুক্ত করে) সংক্ষেপে বর্ণনা করে গবেষণা প্রস্তাবটিকে ফলাফলগুলির প্রাসঙ্গিকতা বা অসম্পূর্ণতা অথবা হাতে নেওয়া গবেষণার দৃষ্টিকোণকে স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে।

IV. ধারণাগত কাঠামো

সমস্যা এবং সেটি সম্পর্কে অনুসন্ধানের তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত করার পর গবেষণা প্রস্তাবের উচিত কী কী ধারণার ব্যবহার করা হচ্ছে এবং গবেষণার পক্ষে সেগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ করা। এছাড়াও সমস্যাটি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষালব্ধ বাস্তবের কোন কোন দিকগুলি পরীক্ষা করা উচিত সেটিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

V. গবেষণার প্রশ্ন বা প্রকল্প

ধারণাগত কাঠামো ও দিকগুলি নির্দিষ্ট করা হয়ে গেলে এই গবেষণা নির্দিষ্ট যে সব প্রশ্নের উত্তর চায় সেগুলিকে স্পষ্টভাবে সূত্রবন্ধ করা উচিত। ব্যাখ্যামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলিকে নির্দিষ্ট করা এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি জানান দেওয়া গবেষণা প্রস্তাবের এক আবশ্যক অংশ।

VI. গবেষণার বিস্তার (Coverage)

উত্থিত প্রশ্ন বা পরীক্ষার জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নমুনা বা স্যাম্পলিঙের প্রয়োজন হলে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানানো উচিত :

১) গবেষণার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র
২) স্যাম্পলিঙ ফ্রেম
৩) স্যাম্পলিঙ পদ্ধতি
৪) পর্যবেক্ষণ এবং স্যাম্পলিঙের আয়তন বা পরিমাণের ইউনিট

গবেষণার জন্য কোনও 'কন্ট্রোল গ্রুপ' বা নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠীর প্রয়োজন হলে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত। নমুনার আয়তন ও প্রকৃতি বা চরিত্র নির্ধারণের ব্যাখ্যা দেওয়াও প্রয়োজন। যে প্রস্তাবগুলিতে নমুনা নির্বাচনের প্রয়োজন নেই, সেগুলির ক্ষেত্রে উচিত যথাযথভাবে তাদের কৌশল এবং যৌক্তিকতার বিবরণ দেওয়া।

VII. তথ্য সংগ্রহ

কী কী ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন তার নির্দিষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত। বিভিন্ন ধরণের তথ্যের প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন উৎস এবং সেগুলি সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও কৌশলেরও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নমালা বা 'সিডিউল' ব্যবহার করা হলে এগুলি সূচিত করা উচিত :

১) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রশ্নমালা বা 'সিডিউল' বন্টন, যেমন চিহ্নিত করণের তথ্য, আর্থ-সামাজিক তথ্য ইত্যাদি ;
২) জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের আনুমানিক সংখ্যা ;
৩) কোনও মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে কী না ;
৪) প্রশ্নমালা বা 'সিডিউলের' মধ্যে কোনও প্রক্ষেপণমূলক পরীক্ষা অর্ন্তভুক্ত আছে কী না ;
৫) এক একটি সাক্ষাৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় আনুমানিক সময় ;
৬) নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করার পরিকল্পনা আছে কী না ;
৭) কোডিঙের পরিকল্পনা।

সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলি জানানো জরুরী :

১) কীভাবে সাক্ষাৎকারগুলি গ্রহণ করা হবে ;
২) সাক্ষাৎকারগুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করলে এগুলি বর্ণনা করতে হবে :

১) পর্যবেক্ষণের ধরণ ;
২) পর্যবেক্ষণের ইউনিট ;
৩) শুধু এই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হবে অথবা অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহৃত হবে।

VIII. তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

কীভাবে বিভিন্ন ধরণের তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হবে, সারনিবন্ধকরণের পরিকল্পনা, কমপিউটারের মাধ্যমে কী কী ধরণের তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হবে—এই সব বিষয়গুলিকেই বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

IX. টাইম বাজেটিঙ (Time budgeting)

কাজটিকে সুবিধাজনক কয়েকটি পর্যায়ে ভেঙে নেওয়া উচিত এবং প্রতিটি পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করতে কতটা সময় লাগছে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

যেমন, এই পর্যায়গুলির অর্ন্তভুক্ত হতে পারে :

১) প্রস্তুতিমূলক কাজ, যার মধ্যে পড়ে কর্মীদের নির্বাচন এবং নিযুক্তি ও তাদের প্রশিক্ষণ ;
২) পরীক্ষামূলক গবেষণা (pilot study), যদি প্রয়োজন হয় ;
৩) নমুনা নির্বাচন ;
৪) উপকরণের প্রস্তুতি ;
৫) তথ্য সংগ্রহ ;
৬) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (এর মধ্যে পড়ে কোডিঙ, সম্পাদনা, কমপিউটার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি) ;
৭) তথ্য বিশ্লেষণ ;
৮) রিপোর্ট রচনা।

X. সাংগঠনিক কাঠামো

পদ, দায়িত্ব, কর্মীর সংখ্যা, তাদের যোগ্যতার স্তর ইত্যাদি সূচিত করে একটি সাংগঠনিক তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

XI.

মোট সময় বা শ্রম-মাস (man-month) ও কী কী ব্যবস্থা প্রয়োজন, এই দুইয়ের দিক থেকে প্রকল্পের ব্যয় অনুমান করতে হবে। এই শিরোনামগুলির অধীনে হিসাব করতে হবে :

পদ-কর্মীর সংখ্যা-বেতন (ভাতা ইত্যাদি সমেত)-স্থায়ীত্ব প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ

১) কর্মীবৃন্দ
২) ভ্রমণ
৩) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ
৪) সরঞ্জাম ও মুদ্রা
৫) উপকরণ (এই খাতে মোট ব্যয় মোট বাজেটের পাঁচ শতাংশের বেশী হওয়া উচিত নয়)

৬) গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি (ব্যয় মোট খরচের পাঁচ শতাংশের বেশী হবে না)

৭) ডাক সমেত নৈমিত্তিক ব্যয়

৮) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন)

৯) স্থির (overhead) ব্যয় (মোট ব্যয়ের পাঁচ শতাংশ)

১০) সর্বমোট ব্যয়।

গবেষণা প্রস্তাবের আনুমানিক বাজেট পেশ করার সময় প্রকল্প পরিচালকের টাইম বাজেট এবং গবেষণা প্রস্তাবের বিভিন্ন স্তরগুলি বিবেচনা করা উচিত। আনুমানিক বাজেটের বিভিন্ন উপাদানগুলির জন্য সময় এবং অর্থ বরাদ্দ করার যুক্তিগত ভিত্তিগুলি উল্লেখ করা একান্তই আবশ্যক।।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

৫.১ সাহিত্য-গবেষণার বিষয়-প্রস্তাবের সংক্ষিপ্তসার রচনার নির্দেশিকাপত্র

নিবন্ধন-প্রার্থীর নাম ❐

সম্পূর্ণ ঠিকানা ❐

দূরভাষ সংখ্যা ❐

১. গবেষণার বিষয়-প্রস্তাবের উপজীব্য এলাকা ❐

২. গবেষণার বিষয়-শিরোনাম ❐

৩. বিষয়-শিরোনামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ❐

৪. গবেষণার সম্ভাব্য মূল প্রতিপাদ্য কী ? ❐

৫. গবেষণার সম্ভাব্য গৌণ প্রতিপাদ্য কী কী ? ❐

৬. সম্ভাব্য মূল প্রতিপাদ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাষা/ সাহিত্য/ সংস্কৃতির কোন্ নূতন/অনালোচিত/স্বল্পালোচিত দিক বিশেষভাবে উন্মোচিত বা সমৃদ্ধ হবে ? ❐

৭. সম্ভাব্য গৌণ প্রতিপাদ্যগুলির গুরুত্ব কী ? ❐

৮. প্রস্তাবিত গবেষণাকে অভিসন্দর্ভ রূপে প্রস্তুত করবার সময়ে প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য অধ্যায়গুলির উপজীব্য কী-কী, (সম্ভব হলে) শিরোনামসহ নির্দেশ করুন ❐ (এই অংশটি ১৫০০-২০০০ শব্দের মধ্যে লেখা বাঞ্ছনীয়) ❐

৯. প্রস্তাবিত গবেষণার সঙ্গো প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কোনও কিছু আলোচনা পড়ে থাকলে, সেগুলির উৎস সহ (বইয়ের/ লেখার নাম ❐ লেখকের নাম ❐ প্রকাশের স্থান ও সময়/ পত্রিকার নাম, সংখ্যা ও তারিখ দিতে হবে) উল্লেখ করুন এবং পূর্বতন ঐ আলোচনাগুলির উপর কী-কী সংযোজন/ সংশোধন/ পরিমার্জন হতে পারে সংক্ষেপে লিখুন।❐

১০. গবেষণা নির্বাহের জন্য আপনি কী-কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন লিখুন (যথা : গ্রন্থ/ নিবন্ধ পাঠ এবং/ অথবা ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং/ অথবা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলির গুরুত্ব ও যাথার্থ্য যাচাইয়ের পর (ক) সুনির্দিষ্ট কিছু তত্ত্ব অন্বেষণ করার প্রয়াস পাওয়া ; (খ) আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তথ্যগুলির বিচার করে সিদ্ধান্ত করা ; (গ) তুলনামূলকভাবে তথ্য বিচার করা ; (ঘ) তথ্যগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক মাপকাঠিতে বিচার করা ; (ঙ) তথ্যগুলির আঙ্গিকবাদী পদ্ধতিতে রস/ সৌন্দর্য/ অন্তর্নিহিত দার্শনিকতার মূল্যায়ন করা ; (চ) তথ্যগুলির সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্যান্য বিদ্যাশৃঙ্খলার সঙ্গো এই গবেষণার (সম্ভাব্য) সম্পর্ক নির্ণয় করা ; (ছ) অন্য কোনও পদ্ধতি (এই ক্ষেত্রে আপনাকে সংক্ষেপে

বুঝিয়ে বলতে হবে)। উত্তর দেবার সময়ে শুধু 'ক'/'খ' ইত্যাদি মর্মে উল্লেখ করুন (জ ব্যতীত)।

১১. প্রাথমিকভাবে প্রাসঙ্গিক একটি বিস্তৃত গ্রন্থ/ নিবন্ধ-পঞ্জি প্রস্তুত করুন (যেগুলি পড়েছেন এবং যেগুলি পড়বেন বলে ঠিক করছেন পৃথক ভাবে উল্লেখ করবেন)। তালিকাটি এইভাবে সাজাবেন :

(বাংলা লেখাগুলির তালিকা প্রথমে, ইংরেজি/অন্যভাষার লেখাগুলি তার পরে উল্লেখিত হবে)

ক. লেখকের পদবি (বর্ণানুক্রমিকভাবে), লেখকের ব্যক্তিনাম ❐ গ্রন্থনাম ❐ প্রকাশকের নাম ❐ প্রকাশের স্থান ❐ সংস্করণ ❐ প্রকাশের বছর) ;

খ. লেখকের পদবি ও নাম (পূর্ববৎ বিন্যাসে) ❐ নিবন্ধের নাম ❐ পত্রিকার নাম ❐ প্রকাশের স্থান ❐ প্রকাশের মাস, বছর এবং সংখ্যা ;

গ. লেখকের পদবি ও নাম (পূর্ববৎ বিন্যাসে) ❐ নিবন্ধের নাম ❐ ওয়েবসাইট পরিচিতি ❐ তারিখ॥

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

৬.০ অনুশীলনী

১. **সংক্ষেপে বর্ণনা করুন :**

(ক) প্রশ্নমালা, (খ) তথ্যসারণি (গ) সাক্ষাৎকার সহায়িকা, (ঘ) সংখ্যাতাত্ত্বিক উপস্থাপনা (ঙ) সম্পাদনা (চ) মুখবন্ধ ও স্বীকৃতি (ছ) বিষয়সূচী (জ) তথ্যমূলক পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জী (ঝ) কাউ ইন্‌ভেক্‌সিং (ঞ) তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি।

২. গবেষণা-পদ্ধতিতে প্রশ্নমানের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব কতটুকু? প্রশ্নমালার গঠন, বিষয়, সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৩. রিপোর্ট কি করে লিখতে হয় তার বর্ণনা দিন।

৪. বিবলিওগ্রাফি বা গ্রন্থপঞ্জী কাকে বলে? এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৫. গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করুন।

৬. গবেষণা-প্রকল্পের প্রস্তাব কি ভাবে লিখতে হয়, দেখান।

৭.০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Young, Pauline V ❒ Scientific Social Survey and Research, 3rd ed, N.Y. Prentice Hall, 1960.
2. Goode, W. and Hatt ❒ Methods of Social Research, New York : McGraw-Hill, 1952.
3. ICSSR ❒ Asian Conference on Teaching and Research in Social Sciences. May 21-26, 1973 at Simla, New Delhi ; Association of Asian Social Science Research Council, 1973
4. ICSSR ❒ A Report on Social Sciences in India : Retrospective and Prospective, New Delhi, ICSSR Review Committee 1973.
5. Ghosh, B.N. ❒ Scientific Methods and Social Research, New Delhi : Sterling, 1982.
6. Dasgupta, S.K. ❒ Methodology of Economic Research, Bombay, Asia, 1968.
7. Agnihotri, Vidyadhar ❒ Techniques of Social Research, New Delhi, M.N. Publishers, 1980.
8. Bajpai S.R. ❒ Methods of Social Survey Research, Kanpur, Kitab Ghar, 1966.
9. Basu, M.N. ❒ Field Methods in Anthropology and other Social Sciences. Calcutta, Bookland, 1961
10. Mukherjee, P.K. ❒ Economic Surveys in Underdeveloped Countries, A Study in Methodology, Bombay, Asia, 1959.
11. Raj, Des ❒ Sampling Theory, Bombay McGraw-Hill, 1968
12. Ramachandran. P. ❒ Training in Research Methodology in Social Science in India. New Delhi, ICSSR, 1971